পরিচয়

সময় ; তোমাকে ...

অন্য মনস্ক কবিতা ও সাহিত্য পত্রিকা

। ৪র্থ বর্ষ । ৫ম সংখ্যা । বইমেলা-২০০৯ । ১৪১৫ বঙ্গাব্দ । মূল্য ১৫টাকা

উপদেষ্টা	ঃ শম্ভু ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সোমনাথ
কার্যনির্বাহী সম্পাদক	ঃ অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়
সহসম্পাদক	ঃ সঞ্জীব চন্দ্র দাস ও সঙ্গীতা মুখার্জী
কোষাধ্যক্ষ	ঃ শেখ মাশুকুল রাহমান ও দেবাশীষ পাল
সম্পাদকমণ্ডলী	ঃ রজত কুণ্ডু, দেবমাল্য চক্রবর্তী, দেবাশীষ মজুমদার, শিল্পী রায়, গোপাল বিশ্বাস, সুব্রত চক্রবর্তী
যোগাযোগ	ঃ ১৭/৫, ফিডার রোড, মণ্ডলপাড়া, ডাক-তালপুকুর, বারাকপুর, কোলকাতা - ৭০০ ১২৩।
চলভাষ	ঃ ৯৩৩৯৭২৭৭৩৪
ই-মেইল	ঃ **samaytomake@gmail.com**
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ	ঃ গোপাল বিশ্বাস ও অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক	ঃ 'সময়(তোমাকে...' কর্তৃক প্রকাশিত
বর্ণ সংস্থাপন	ঃ কিউ-টেক্ সিস্টেমস্, ৩, সুকান্তপল্লী, বারাকপুর
বিনিময় মূল্য	ঃ **পনেরো টাকা মাত্র** (ভারতের বাইরে অতিরিক্ত)

সময়; তোমাকে...

০ সূচী ০

সময় ; তোমাকে...

অন্য মনস্ক কবিতা ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রথম কথা	ঃ সোমনাথ
এপার বাংলার কবিতায়	ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পিনাকী ঠাকুর, উদাস বসন্ত, শঙ্খ ঘোষ, সঙ্গীতা মুখার্জী, তুলি, সমীরবরণ ভট্টাচার্য্য, শ্যামল কান্তি মজুমদার, অয়ন দাস, শ্রীজাত, সুজন ভট্টাচার্য, অভি, জগন্ময় মজুমদার, সুব্রত চক্রবর্তী, সুমিতা দেব, নবারুন ভট্টাচার্য, শম্ভু ভট্টাচার্য, দেবাশীষ মজুমদার, অমল চক্রবর্তী, মৃদুল দত্ত রায়, রাজু চক্রবর্তী, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, শেখ মাশুকুল রাহমান, উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস রায়চৌধুরী, তোর্ষা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল বিশ্বাস, রুপম ইসলাম, মুহঃ আকমাল হোসেন, দেবমাল্য চক্রবর্তী, সঞ্জীব চন্দ্র দাস, রজত কুণ্ডু, দেবাশীষ পাল, অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ।
নিবন্ধ	ঃ চন্ড ভার্গব
কাব্যিক-গদ্য	ঃ তমাল রায়
ওপার বাংলার কবিতায়	ঃ হরিচরণ সরকার মণ্ডল, সাইফুল আহসান বুলবুল, মশিউর রহমান মসী, নিখিল চৌধুরী, সমরেশ দেবনাথ, আশিকুর রাজ্জাক, নাজমা আকতার, বদরুল হায়দার, সুফী সৈয়দ রুপক রশীদ, মাসুম রেজা তরু, মৌ মধুবন্তী
লোকসংগীত	ঃ বিমলেন্দু মজুমদার
বিশেষ রচনায়	ঃ হারামখোর

প্রথম কথা

আমাদের ভুল করবার এবং স্বীকার করবার অধিকার আছে বলেই-হয়ত বলতে হয়, বইমেলা সংখ্যার 'সময়(তোমাকে...' বিষয়ভিত্তিক হতে পারতো! সময়ের প্রতিনিধিত্ব করাই যখন আমাদের স্বধর্ম। হতে পারতো নন্দীগ্রাম থেকে লালগড়, কৃষি থেকে শিল্পায়ন, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা থেকে ২৬/১১ ঘটনা, যুদ্ধ মৌলবাদ থেকে মৌলযুদ্ধবাদ-সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বিস্তার।

প্রকাশ তো আমাদের মেলাতে, আর মেলা মানেই তো মিলন! উত্তরাধুনিক বি-নির্মানেও এর অর্থের হেরফের ঘটেনি বলেই বৌদ্ধিক ভাববিকাশের ও বিনিময়ের মহাক্ষে ত্রই বইমেলা। আর যেহেতু সাহিত্যের কোন স্বধর্ম হয় না, সে-যে নদীর মতই নিজের প্রকাশ, নিজেই করে নেয়। তাই 'সময়(তোমাকে...', সেই ধর্মই পালন করেছে!

একথা অনস্বীকার্য, লিটল ম্যাগাজিনের গোত্র চেনায় তার সম্পাদকীয়। তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়, মুমূর্ষ ভাবনার। তাই ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে বড়ো হয়ে ওঠে দায়িত্বের যুপকাষ্ঠ! আর যখন শির শির করে ওঠে শিয়ালদহে বা মেট্রো রেলের পাদানীতে পা রেখে! গরম পোষাকে কাঁপতে হয় চিড়িয়ামোড়ে বা বারাকপুর স্টেশনে! যে স্বজনেরা অতর্কিত আক্রমণে বিগত, তাঁদেরও হয়ত এভাবে তটস্থ হতে হয়নি। মানুষ তো চিরদিনই মূর্ত্তিমান শক্তির চাইতে অদৃশ্যকেই ভয় পায়, বেশি সম্ভ্রম করে! আর এতেই স্পর্ধা পায় ঈশ্বর বা শয়তান। এর থেকে নাস্তিকেরও নিস্তার নেই! ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আসতেই ধর্ম আসেই। ঈশ্বর তো মৌলিক নয়—বহুধর্মে বিভক্ত! মহান শক্তিমান মানুষ সবই পারে! ঈশ্বরের মত ধর্মকে, ধর্মের মত রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রব্যবস্থা বা দলীয় রাজনীতিকে বিভক্ত করতে। তবে কোন স্পর্ধায়—মানুষ সামাজিক জীব? ইংরেজ কবি তা বলেছেনই—

Yes in the sea of life enisted.
With echoing strains between us thrown.
Dotting the shoreless, watery wild.
We mortal millions live alone....

(Mathew Arnold/To Maggucrite)

না! তবুও তো দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে ভালোলাগে, না! যখন আমাদের সঞ্জীব, 'সময়(তোমাকে...' এর হয়ে বাঙালি রাষ্ট্রে গিয়ে, সংগ্রহ করে আনে সে দেশের কবিদের নাভিকুন্ড — তখন সমৃদ্ধ তো হতেই হয়। আর পূর্ণ হয় হৃদয়ের ভাষা যখন—হরিনারায়ণপুর, নোয়াখালীর বিমলেন্দু মজুমদার মহাশয় লেখেন, — ''সময়(তোমাকে...' কবিতা ও সাহিত্য পত্রিকায় আমার স্বরচিত প্রবন্ধ ''লোকসংগীত চর্চায় নোয়াখালী'' ছাপানোর জন্য অনুমতি দিচ্ছি'' তখন। এ প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেই হয় 'দূত' ও 'প্রতিকাশ' পত্রিকার সম্পাদক মাসুম রেজা তরু ও সাইফুল আইসান বুলবুলকে।

সমৃদ্ধ করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ ও কবি নবারুণ ভট্টাচার্য। যাঁরা অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের কবিতার পুনঃমুদ্রণে। এছাড়াও 'সময়(তোমাকে...'-র স্বজন কবি শম্ভু ভট্টাচার্য ও রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক মহাশয়ের হার্দিক সহযোগিতা। তাঁরা একাকার করে দেয় সময়ের সমস্ত দূরত্বকে। নির্ঘোষে বলেন, একটু পা চালিয়ে— অমৃতকুম্ভ এখনও আমাদের, হ্যা, আমরা অমৃতের সন্তান। মাথার উপর আজও অখণ্ড আকাশ! আমরাই সাঁতরে যাবো মহামানবের সাগরতীরে—

মাথার 'পরে একটাই তো আকাশ আজ!
বিস্ময় দেয়, ভোগায়-নিরাপত্তা হীনতায়
ধূসর মাটি ধুলো মাখে
চাঁদ-সূর্যের রাখালিয়া সুর।

এই আলকাটা জমির দেশে
উর্বর ভাষায়...
প্রপিতামহের মত পিতাও বলতেন
ফসিল স্বরে, আমিও বলি
মাটিও বলে
বাতাস, জল, ঐ জ্যোতিষ্ক
আকাশগঙ্গা ছায়াপথ...

দুই পুরুষের মাঝে, আজ
শুধুই আকাশ-গঙ্গার ভাঙা সাঁকো

অপেক্ষায় আছি

সাঁতরাবার অপেক্ষায়...

আমরা অপেক্ষায় থাকলাম। বিভেদমুক্ত পৃথিবীর অপেক্ষায়! ভালো থাকবেন। থাকতে তো-হবেই...!!!

সোমনাথ
২৫শে পৌষ, ১৪১৫

এপার বাংলার কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মায়া নদী

ব্রিজের ওপরে ট্রেন, লোহার ঝঙ্কার শুনে আচমকা
জেগে উঠি আমি
নিচে এক নদী, ঠিক নদী নাকি?
নীল জোৎস্নায় ভেসে বয়ে যাচ্ছে কোন স্বর্গলোকে?
মনে হয় অলৌকিক, মায়া নদী, আসলে সে নেই
অথচ সেতুটি মায়া নয়। খুবই সত্য, দৃঢ় অস্তিত্ব মুখর
তা হলে নদীও আছে, ছল ছল শব্দ জেগে আছে
ট্রেনে এত মৃদুগতি, যেন তার স্বপ্ন এই নদী
এ স্বপ্ন যেন না ভাঙে, ওকে আরও ঘুম দিতে হবে
আমার চোখের থেকে কিছু ঘুম আমি সেই নদীটিকে দিই
তাও কি যথেষ্ট, আরও চাই, দীর্ঘ এক ঘুমময় স্রোত
আমার পাশে যে নারী, তার চোখ থেকে কিছু
ঘুম নিতে পারি
কামরার আরও কত ঢুলুঢুলু চক্ষু, দাও
কিছু কিছু ঘুম তুলে দাও
সবাই অঞ্জলি দিলো, এখন নদীটি আহা গভীর বিভোর!

পিনাকী ঠাকুর

একলা দাঁড়াও

এবার আমি প্রথম থেকে তোমায় ভালবাসতে পারি!
একলা দাঁড়াও রোদ বাঁচিয়ে। যেদিন থেকে খুঁজছ বাড়ি
খুঁজছ কিস্তিবন্দি জিনিস, জীবনবীমার বেস্ট পলিসি,
আমি তোমায় ভালবাসছি সারা শহর, যেমন নিশি
ডাকলে মানুষ শয্যা ছেড়ে রাতবিরেতে পাগলপারা
বনবাদাড়ে-জলা-ডাঙায় ঘুরছে, শুধু ঘুরেই সারা...
তেমন করে বাসছি আবার, বাসব ভাল প্রথম থেকে
আবছা হাসির প্রশ্রয় দাও, নাম কী বলো, পাড়ার কে কে
বইটুকে প্রেমপত্র পাঠায়? ওদের সঙ্গে ডুয়েল ল'ড়ে
বাসব, তুমি একলা দাঁড়াও, ভালই বাসব নতুন করে!

উদাস বসন্ত

তুই আমার...

তুই আমার অন্ধকারে এক চিলতে রোদ্দুর
তুই আমার রোদ্দুরে এক বিন্দু আলোক কণা (
তুই আমার বৈশাখের কালবৈশাখী
জ্যৈষ্ঠের দাবদাহে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টিকণা।

তুই আমার—ক্লান্ত দেহে শেষ শক্তিটুকু
তুই আমার সবাই চলে যাওয়ার পরে একলা দু'বেলা
তুই আমায় জীবনানন্দের সুরে—
বেলা-অবেলা-কালবেলা।

তুই আমার দিনপঞ্জি এভাবেই চলতে থাকা বারোমাস (
সেই যেখানে কেউ নেই কোথাও সেখানে একটু ভালোবাস্।

শঙ্খ ঘোষ

ঠাঁই

কথায় ভরে গিয়েছে সংসার
সেখানে আজ আমার নেই ঠাঁই
তুমি তোমার পাথরভাঙা কোলে
থাকতে দেবে? জরির রোশনাই

দুচোখ আমার জ্বালিয়ে যায় শুধু
বুকের উপর সুন্দরী এক চিতা
থাবায় থাবায় শব্দ খুঁড়ে আনে
তুমি তখন জানতে পারো নি তা।

না, আমাদের ওসবে কাজ নেই
আমরা চলি নিষ্ফলনের দেশে
যেখানে সব ক্ষান্ত শ্যামলিমা
সত্তা এসে সত্তাহীনে মেশে।

সঙ্গীতা মুখার্জী

দ্বিতীয় জন্ম

বহু পথ চলেছো তো একা!

পাষান-কঠোর বুক চিরে

তোমাতেই এ-দহন বেলায়(অবগাহনে
জীর্ণদেহ ভেসে যায়...
কোন অবকাশে।

ভেসে যায় জীর্ণদেহের উষ্ণ লোনা স্বাদ
তিস্তা! হিমবাহ শীতলতায়
মিশে যায়(তোমারই সাথে...

কবিজন্মের সমস্ত বিষাদ।

তুলি

ইচ্ছে ডানা

ধূসর পেরোতে চাই ধূসরতার সন্ধানে
অন্ধকার এসে মুছিয়ে দেয়
সযত্নে আলো
ঢেউ এসে ভাঙবে বলে
খোলা বুকে রেখেছি নরম পাষাণ

জন্মান্তরে,
বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় যে
সে তিস্তা আমি দেখিনি কখনো।

শ্যামলকান্তি মজুমদার

নিহিত আনার

অন্ধকার জড় হচ্ছে রাত বারোটার
অন্ধকার বড় হচ্ছে চাঁদের আলোতে
গাছে গাছে গোপনীয় কী মৃদু সম্ভার
ক্রমশ প্রকাশ্য মায়া, বেণীবদ্ধভার
খুলে পড়ে আপনা-আপনি পরম জ্যোৎস্নাতে।

বিকল্প খামের বুকে স্মৃতি ছলনাতে
আসে মৃত্যু আলোচনা। প্রাণে গ্রন্থণার
আঙুলে আঙুলে স্পর্শ। নিহিত আনার
পেকে ওঠে ঘনতর যন্ত্রণার শীতে
আকণ্ঠ পানের তৃপ্তি রাত্রি নিশুতিতে।

সমীরবরণ ভট্টাচার্য্য

থাকো প্রতীক্ষায়

এ তুমি করেছো কি?
লক্ষ্মীটি এখুনি ছুঁয়োনা
সময় আসুক থাকো প্রতীক্ষায়।
উৎসবের হাটে তুলে নেব
রেশম কোমল দুটি হাত...
চেয়ে চেয়ে দেখছো কি?
সবে তো বোশেখ, ভরা শ্রাবণের
সরস মাটিতে পুঁতবো বীজ,
শরতের পাগল-পারা গন্ধ মেখে
শিউলিতলায় নেব প্রতিজ্ঞা।
পৌষালী শীতে দিও উষ্ণ পরশ
বসন্তে খেলবো আবীর একান্তে
বাঁধবো বাসা অগুরু চন্দনে,
মলিনতা ধুয়ে বিবসনা জ্যোৎস্নায়
সেরে নেব স্নান।

অয়ন দাস

একটি কবিতা

এক দল মারে
এক দল মার খায়
এক দল হারে
এক দল জেতে

কখনও আবার ইতিহাস
বারুদ হয়ে ফেটে পড়ে
মজ্জা, মাংস, হাড়ে

এ কোন্ গৌরবে তুমি
গড়ো জয়ের পৃথিবী
যেখানে কেঁদে ফেরে
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা
ভোরের ভৈরবী।

সুজন ভট্টাচার্য

কাক তাড়ুয়া

তিন ফসলিতে পা পোঁতা আছে
দু'হাত আকাশে টান
দিগন্ত জোড়া মুখের আদল
আ(াদে আটখান

হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ
আর পায়ের তলায় কাঁপন
মাথা তাক করে গুলি ছুটে যায়
স্তব্ধ জীবন যাপন।

চলতি কা নাম গাড়ীর চাকায়
মাটির গভীরে দাগ
ছিটানো খইয়ে জানাজা সফর—
কাকতাড়ুয়ারা ভাগ।

শ্রীজাত

স্বপ্নে এ সব হতো

হাওয়ার মধ্যে ভাসে
নরম জলের বোতল
কুয়াশা নীল ঘাসে
জড়ায় ওতপ্রোত

জলের মধ্যে ভাসে
নরম ঘাসের হাওয়া
শিকারি তল্লাশে
পায় না কোনও আওয়াজ

এসবই ঘুম জানে
স্বপ্নে এ সব হতো
অবচেতন মানে
কুয়াশা নীল বোতল...

অভি

নষ্ট হয়েছিলে বুঝি?

এক একা নদীর তীর,
সূর্যের চলে যাওয়া.....
ওপারের অনেক দূর কোন কলেজ চত্বর,
আসতেআসতে নির্জণ!
অচেনা পাখিদের ভীষণ শব্দদূষণ,
এড়িয়ে.....
সব হারানোর show-cause,

আজও তো তুমি এসেছিলে.....
স্বপ্নের সাদাকালো ক্যানভাসে।
কী ভীষণ লাগছিল তোমায়?
রক্তমাখা মুখ, অনেক যুবকের লাঞ্ছনা,
সারা গায়ে মেখে.....
নষ্ট হয়েছিলে বুঝি? কাল সারারাত !

জগন্ময় মজুমদার

ঘরবাড়ি সংক্রান্ত

আমি যদি পুবের হই তুমি তবে দক্ষিণ দেয়াল
পাগলা বাতাস তোমাকে জাপ্টে রেখেছে
তুমি সামলাতে গিয়ে কেমন আগোছালো
আমি তো প্রথম আলো সারাবেলা হয়ে আছি

ঘরের তো চারটে থাম আছে
তুমি বা আমি একটাও হতে পারিনি
ছাতার ডাঁটির মত প্রধান স্পেশাল
না তুমি না আমি

মেঝে হওয়াও সম্ভব ছিল না
বুক পেতে দিতে এখনো শিখিনি
তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো যদি পারো...

নিদেন একটা জানালা হও
দেয়াল ভেঙে
আলো হয়ে ঢুকবো ফোটন ফোয়ারা

সুব্রত চক্রবর্ত্তী

নগ্নতার কাছে

মেঘগুলো সরতে থাকে
আবরণ সরাতে সরাতে
সারা রাত জোনাক জ্বালা কালবেলায়
নবকুমার সভায়
নগ্ন স্বয়ংবর।

মেঘগুলো মরচে ধরে—
কালো পিচে ঢাকতে ঢাকতে।
সারাজীবন আগুন-জ্বলা লাল বেলায়—
স্মৃতিবিজরিত সভায়
নগ্ন চিতার ধোঁয়া।।

ধোঁয়াশাভরা কালবেলায় নগ্ন মেঘ—
সব লজ্জা ধুয়ে মুছে
সব কালি সাদা করে
নগ্ন শরীরে, এক মুঠো দুর্ব্বা তুলে আনে।

সুমিতা দেব

সময়

সকাল থেকে বৃষ্টি ভেজা রাত
সকাল থেকে অজস্র অভিশাপ
অথবা সন্ধেগুলো গ্রীষ্ম দুপুর সাজে?
ধরো যদি অমন বয়স আসে
তুমি আমি কুঁচকে যাওয়া ত্বকে
চুমু খাব একে অন্যের ঠোঁটে ?
পরিবর্তন সময়পট ধরে
অদল-বদল বয়স-সীমার পথে।
ক্ষতির খাতায় হিসাব রাখো যদি
বে-হিসেবি রক্ত মাংস মাপ
দেখবে এক মন ভালবাসা হয়ে জুড়ে আছে অন্য এক মনে।।

রোগমুক্তি

আন্দামানের সামুদ্রিক শৈবাল আর
সুন্দরবনের যৌবনবতী মহুয়া—
উপাচারদ্বয় মিশিয়ে সে মিশ্রণ ঢালব তোমার জিভে-ঠোঁটে।
শ্লথ গতিতে আরোগ্য আসবে.....
অনুপানের সামান্য ত্রুটি বন্য কুকুরের মত
ফালা ফালা করে দিতে পারে তোমার শরীর।

মনে করো, তুমি সুস্থ নীরোগ
সাতসকালে ডাক পাঠিয়ে হাঁটতে গেছ অফুরন্ত পথ—
আমার প্রেমের সাতসমুদ্র লজ্জা
লাল করেছে তোমার ঠোঁট।
রাত-বিরেতে তোমার দিকে দেখি
ভাবনা আমার সমুদ্দুরে ডোবে।
লোনা স্নানে বিস্বাদ শরীর চালায় মন্থন
আন্দামানের শৈবাল খোঁজে ?

নবারুণ ভট্টাচার্য

একটি ফুলকির জন্য

একটা কথায় ফুলকি উড়ে শুকনো ঘাসে পড়বে কবে
সারা শহর উথাল পাথাল, ভীষণ রাগে যুদ্ধ হবে
কাটবে চিবুক, চিড় খাবে বুক
লাগাম ছেড়ে ছুটবে নাটক
শুকনো কুয়োয় ঝাপ দেবে মুখ
জেলখানাতে স্বপ্ন আটক
একটা ব্যথা বর্ষা হয়ে মৌচাকেতে বিঁধবে কবে
সারা শহর রক্ত লহর, আশ মিটিয়ে যুদ্ধ হবে
ছিড়বে মুখোশ আগ্নেয় রোষ
জ্বলবে আগুন পুতুল নাচে
ভাঙবে গরাদ তীব্র সাহস
অনেক ছবি টুকরো কাঁচে
একটা কুঁড়ি বারুদ গন্ধে মাতাল করে ফুটবে কবে
সারা শহর উথাল-পাথাল, ভীষণ রাগে যুদ্ধ হবে।

শম্ভু ভট্টাচার্য

গাজন

শিব হে
আমি আটচালার টঙ্ হতে বঁটিতে ঝাঁপ দেব
আমি বানফোঁড়া হয়ে দেখব সংক্রান্তির আকাশ
আমার পিঠে বঁড়শি গাঁথা হবে
আমি কালচক্রে যুঝে নেব অষ্টদিকপাল

শিব হে
আমি ফার্নেশের লোহার মতন গলে যাব
গোপন ব্লাস্টে বিগ ব্যাং উড়ে যাবে
আমার হাড়-মজ্জা-মাস

শিব হে
আমি অগ্নিস্রোত হব
আগুনের নদী

শিব হে

দেবাশীষ মজুমদার

আহত দৈনন্দিন

সবাই কেমন দাপিয়ে বেড়ায় দেশান্তরের টানে
আমি তখন আটকে থাকি তেপান্তরের ঘ্রাণে (
শিল্পায়নের উষ্ণ বাতাস আই.টি. ও সেনসেক্সে
লিখছি আমি তোমার কথাই একলা বসে ডেক্সে।

আট প্রহর আর একঘে' জীবন মন লাগে না কাজে
আমায় কেবল হাতছানি দেয় নীল আকাশের ভাঁজে
মেঘের সারি সরিয়ে আমি খোঁজ এনেছি পদ্য
তোমায় ছাড়া সকল বিষয় আমার যে দুর্বোধ্য।

অশ্রু ভেঙে কব্জা এঁটে সব লোকে চায় জিততে
আমি বরং পুকুর ঘাটে ব্যাঙাচি করি মিথ্যে
ভীষণ বেগে সময় বহে চিহ্ন করে লুপ্ত
মন আগলে কাটুক জীবন তোমার সাথে গুপ্ত।

বাঁচতে গেলে ছন্দকে চাই, প্রেম লাগে হাত মুঠো
ঘর বেঁধেছি স্বপ্ন ঘিরে যথেষ্ট খড়কুটো (
হলুদ-সবুজ নক্সা যে সব আমার সে সব ফিকে
আমায় শুধুই ভাবিয়ে মারে তোমার হিসেব-নিকেশ।

অমল চক্রবর্তী

যন্ত্রণা

শুকনো মাঠ থেকে মেঘ নিয়ে ফিরে এসেছি ঘরে
সবাইকে আমি বিলিয়ে দিয়েছি মেঘগুলো
কিন্তু কেউই আমাকে কোনো প্রশ্ন করেনি মেঘ বিষয়ক
সবাই জানতে চাইছে শুধু মাঠের কথা

সবচেয়ে যে ছোটো, এসে আমাকে দ্যাখালো
দ্যাখো দ্যাখো মেঘের গায়ে লেগে রয়েছে মাঠ

অথচ আমি তো মাঠের যন্ত্রণা থেকে
শুধু মেঘগুলোকেই কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনেছি

মৃদুল দত্তরায়

শ্মশান গাথা

১
উর্বরতার অর্থ জানি

নদীর পাশে সন্ধ্যা নামে
পোড়া কাঠের গন্ধ দিতে
দূরে কোথাও চিতা জ্বলে
২
দরজা খুলে যা পেয়েছি
দেওয়ার মত নয়
পোড়া ঘিয়ের গন্ধে আমার
প্রথম প্রেমের স্বাদ
৩
শ্মশান হয়ে বসে ছিলাম
উর্বরতাহীন
জ্বলতে এলি
আমার এবার মুখর হওয়ার দিন
৪
নদীর জন্য
আর যা কিছু
রক্ত কিংবা ছাই
ভাসতে জানি
বলনা নদী
পোড়ার জ্বালা কী?
৫
সহজ করে পুড়তে বলো
''তীব্র করে বাঁচিস''
গাঁটছড়াটা ফসকে না যায়—
দেখিস্, নদী দেখিস॥

রাজু চক্রবর্তী

ভালোবাসা

তখন আমার অঙ্ক পরীক্ষার দিন
বই-পেনসিল, খোলা জানালা
অবাধ যাওয়া-আসা...

রক্তে তখন উথাল-পাথাল উপাখ্যানের ঋতু
তখন তোমায় চেয়েছি...

বেড়েই চলে মুখের মিছিল,
মুখের পথ বেয়ে...

কুয়াশাজাল ছড়ায় ক্রমে অনেক অনেক দূরে

রক্ত পড়ে ক্ষ তস্থানে কে টানে কার হাত !

কালের গানের সুর থেকে যায়
সারা জীবন জুড়ে
একলা খেয়া ফেরিঘাটে,
দোলে পারাপারের আশা

কেউ কি কাঁদে ওপার থেকে
কেউ কি গায় গান!
রাতের নদীর কালো জলে একঘেয়ে বয় হাওয়া

তখন তোমায় চিনেছি...

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

দাম্পত্য

দু'জনে দু'মুখো বসে পিঠে রোদ নিয়ে
শীতের রোদ্দুর
মুখে বুকে কোলে ছায়া আদুরে বিড়াল
আলগোছে পায়
কখন যে লাফাবে নেই জানা (
তুমি কি ভাবছো জানি
আমারও উজানি-নৌকা ঘাটে ঘাটে থেমে থেমে যায়।

পিঠে তাত, সেই তাত রক্তের সোঁতায়।

হঠাৎই নাতিকে বললে, শোন, দাদু শোন,
তোর এ দাদাটা না আজন্ম চন্ডাল।

আমি তো আহত বাঘ
তাল খুঁজি লাফ দেব অসতর্ক পেলে।
আমাকে ভ্যাবলা করে চিরকাল যেমন করেছ
উঠে গেলে চলে

নুয়ে পড়ে আধবালতি জল
রোদে রাখলে(দিলে
তুলসী পাতাও খান দুই
আদুরী বৌমাকে ডেকে
হেঁকে বললে, 'ওই, মুখপুড়ি! বলি তোকে শোন্,
বুড়ারে বলিস এই আধবালতি জলে
রোদে বসে সারে যেন বেলাবেলি স্নান।

সে সময় তাতা রক্ত ঝমঝম
আমার মাথায় নড়ে চড়ে।

শেখ মাশুকুল রাহমান

তোমার সাথে দেখা

১
নদীর সাথে দেখা
একী তোমার রূপ
এক গণ্ডুষ নিতে
লাগলো নাকি খুব?

২
তোর সাথে করতে দেখা
'চোখ গেলো, চোখ...'
'বউ কথা কও' বলে পাখি
একটু করিস শোক।

৩
নদীর সাথে খেলা
বাচাল দুপুর ম্লান
জাপটে ধরে ঠোঁটে
অকাল-বেলায় স্নান।

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনরাবৃত্ত

তোমরা যাবে বলেই আসো
তোমরা দুদিন ভালোবাসো
কিছু বোঝার আগেই কখন যাও হারিয়ে
আমি কুড়িয়ে পাওয়া সুখে
আর স্বপ্ন ভাঙা বুকে
দিই গানের জন্ম প্রাণের মূল্য দিয়ে
দেখে আসা-যাওয়ার খেলা
আমার পড়তে থাকে বেলা
আমার সুরের আকাশ রাঙায় আস্তরক্ষা
ভেসে গোপন সুখের ঋণে
যত গল্প-হওয়া দিনে
অমার শুকোয় না আর চোখে জলের দাগ
তোমরা কখন কাছে ডাকো
কখন ভুলেই ভালো থাকো
আমি বুঝেও আলেয়াকেই আলো ভাবি
তোমরা দু'দিন হেসে খেলে
চলে যাও আমাকে ফেলে
সাথে নিয়ে আমার সুখের ঘরের চাবি
আমি আবার চলি একা
একা একা জীবন দেখা
আবার সঙ্গীহারা রাত্রি-দিন-দুপুর
আমার ফুরিয়ে আসে কথা
আমার পুঁজি অপূর্ণতা
আমার শূণ্য চোখে ঝরে গানের সুর।

বিভাস রায়চৌধুরী

মায়াতরু

সম্পর্ক কী হবে, ভাবি।

জলকণা মিশেছে বাতাসে।

দিবস বিষণ্ণ তরু...
মায়াতরু...নিকট-নিশ্বাসে...

বিদ্যুতে লিখেছি তোকে।

পলক ফেলবার আগে মৃত।

সম্পর্ক কী হবে, ভাবি।

সম্পর্ক আমাকে ছিঁড়ে নিত!

তোর্ষা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

বন্ধুরা সব তোমার বেশ ধরে
আসে,
লোভে লোভ ঢেকে দেয় আমার শরীর
'বেইমান বেইমান' চিৎকার করে ওঠেন
আমার ঈশ্বর,
কে বেইমান? কে? বেইমান কে?

আমি এক মানুষ কে চিনি,
ইমানের সিঁড়ি থেকে যাকে
লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে
কৌমার্য...

গোপাল বিশ্বাস

ক্যানভাস

মুখোমুখি দাঁড়াও আর একটি বার...
মোমের নরম আলোয় জুড়িয়ে যাক চক্ষু দ্বয়,
কিন্তু আঁধার আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে ধরে,
যন্ত্রণা বুকে বছর কেটে যায়।
বিগত ক্ষ ত এখনো দগদগে
কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে-আসা বোবা মুখ
প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।
প্রতিবাদী হতে চায় ফুল-পাখি-আকাশ-বাতাস।

সময়ের ক্যানভাসে ধূলো জমে জমে
বিকৃত ইতিহাস, ইতিহাস হয়ে ওঠে
বুকের জমাটবদ্ধ শীতল বিষ।

রূপম ইস্‌লাম

সাড়ে চব্বিশে মে ২০০৭

নক্ষ ত্র ভাঙ্‌ছে ইগো-র গরাদ
নক্ষ ত্রীয় থেকে হ'তে চাইছে ক্ষ ত্রিয়!

সে আমায় ছুঁয়েছে
বুঝেছি তাকে ছুঁয়েই
পৃথিবীর চোখ এড়িয়ে সে সব
আকাশ দেখেছে।

কবিতা কীভাবে গদ্যের প্রাসাদ গ'ড়ে
উদ্বাস্তু থেকে হ'বে সম্পদগোত্রীয়?

আমার চোখ বেয়ে
নেমেছে নারীর অশ্রু
খুব কমবার-ই তো সে আমায়
নাম ধরে ডেকেছে...

মুহঃ আকমাল হোসেন

বিশ্বাস

ঘর-বাড়ি ঘিরে আলো-হাওয়া
আর, নিরাকার ঈশ্বর...

আমার দু'শো ছয়টি হাড়ে
বিশ্বাসের পূর্ণ মজ্জা

আমি চিনে চিনে পা ফেলতে পারিনি
পৃথিবীর জলে-স্থলে।

উদ্‌ভ্রান্ত নয়, সরল দার্শনিকতায়
পূর্ণ বিশ্বাসে বিষপান করেন
''সক্রেটিস।''

দেবমাল্য চক্রবর্তী

ভেবে দেখলাম

১
মরচে ধরা নীতিবোধে
নতুন কিছু অন্ধকার
আমির খান-ই প্রমাণ এখন
কোকোকোলার শুদ্ধতার,

আগুন-রাঙা পলাশ ফুল
সাক্ষী আমার মুগ্ধতার
অ-শরীরির জঙঘা দেখে
বাঁধ ভেঙেছে যৌনতার,

শেষে সব শেষ হবে (জানি
কি দরকার অপেক্ষার ?
চলো আমরাও শরিক হই
থার্ডলাইনের নগ্নতার.....।

২
একলা হতে চাওয়ার গোপন মূহুর্তে
সার দিয়ে দাঁড়ায় সভ্যতা
বন্য নাগরিকতায় ধ্বংস, বর্বরতা, আর—
খুন হয়ে যায় আমার স্বভাবিকতা !

আমদের করোই নিস্পাপ পবিত্র নগ্ন মন নেই
পছন্দের দাবীতে অচ্ছুৎ তাই পছন্দসই স্তন,
'কপি' হয়ে শুধু গাছে-গাছে লাফালাফি করি
আঁতলামির শেষ ঠিকানা হয় নন্দন।

তবুও স্বপ্নে অগ্নিময় স্পর্শ
ভালোইলাগে বিষাক্ত, আমেজভরা ঘ্রাণ
ঘেমো হাতে ফুটে ওঠে দু-খানা সূর্য
তছনছ হয়ে যায় পুরুষত্বের অভিমানে।

সঞ্জীব চন্দ্র দাস

পথ

১
কেউ আমায় ভালোবাসে না—

চারিদিকে জোনাকিদের ভিড়
অন্ধকারের সম্ভোগ তারাদের সাথে
হৃদয়ের খণ্ড-খণ্ড টুকরো নিয়ে
চলে গেছে কারা !

২
গাছে গাছে ফোটা ফোটা মৃত্যু ঝ'রে
আমার বুকে ঝরা জবা...
(জবারে তোর কপাল ভালো)
যন্ত্রণার নাম বহুবর্ষী
ভালোবাসার গ্যাঁজলা এ বুকে
রাতদিন স্বপ্ন বমি করে।

রজত কুন্ডু

বোঝাপড়া

১
মুঠির ভিতর থাকে না আকাশ
আঙুল কাটে বিদ্যুৎ ফলকে—
আমি বৃষ্টি ভেবে চেয়ে থাকি...
বিন্দু-বিন্দু ঝরে যায় স্বপ্নের পৃথিবী।

২
তিনভাগ জল
একভাগ অতন্দ্র উঠোন
মাঝে-মাঝে দু-একটা মাথা উচু ঝাউ,
সবুজ আর নীল
নীল আর ধূসরতা—
মিলেমিশে আর একবার বিশ্ব রচনা।

লিটিল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্যে

হয়তো আমি হারিয়ে যেতাম—
সূর্যালোকে শিশির কণার মতো !
এখন সবাই আদর করেই ডাকে,
তখন কি আর ডাকতো আমায় অত ?
ভাগ্য ভালো বাড়িয়েছিলে হাত,
রঙীন হল বাদবাকি সব দিন।
স্বপ্ন এখন শুধুই তোমায় ঘিরে...
প্রিয়তমা, লিটিল ম্যাগাজিন।

দেবাশীষ পাল

গোল্লাছুট

১
এস, হাত মেলাও, শৃঙ্খল গড়ি সব।
শৃঙ্খলের বাইরে যারা, তারা সব চতুষ্পদ
ওরা ছেঁড়া শুকতলায় ঘুরে মরে দেশজুড়ে
দানাপানি জোটেনা পেটে হাহাকার মরে
মুরগীর মাংস ঝোলে চোখের সামনে—
পেন্ডুলামের মতো,
তবু সব আদর্শের
ধামাধরা, ছুঁচো।
এসো, আজ ওদের মাংসে কাট্‌লেট বানাই
হাড়গুলো চুষে, মজ্জাটা তারিয়ে তারিয়ে খাই।
টাট্‌কা রোস্টের জন্য যুগ যুগ জিও !
ইতি, ভালোবাসা নিও।

২
আসছে রাত,
ধরবো হাত,
আমরা তখন আদম-ইভ,
মহাযজ্ঞের বুড়ো শিব।
শাসন-দণ্ড করবে শান্ত,
প্রকৃতির যত কর্মকাণ্ড,
সকাল হলে, স্বার্থ মেলে,
আমরা আবার পগারপার।

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বসন্ত গীতি

[যদি পারো তো আজ শান্ত করো ক্লান্ত মাথার ব্যামো—শ্রীজাত, 'মস্করা', 'উড়ন্ত সব জোকার'।]

লিখেছি চুম্বক শর্ত লিখেছি দোতারা।
লিখেছি মরণ ঘুম লিখেছিল যারা
তাদের সবার নাম রঙীন কাগজে।
তুমিও বুঝেছো কবি এ ভাষাই বোঝে।
বুঝেছি রক্তের স্বাদ তৃষ্ণা সংহিতা,
প্রেমিকা বিপাশা আর বান্ধবীটি সীতা।
সীতার রাবণ সঙ্গী, উগ্র জৌলুস,
'আমাকে স্পর্শ দাও'-হৃদয় উস্‌খুস্‌।
শরীরে রক্ত নেই শরীর ফ্যাকাশে,
''আচ্ছা বান্ধবী কি কবিতা ভালোবাসে?''
(হয়তো বাসে, আবার নাও ভালোবাসতে পারে)
শর্তের মাধ্যম দিয়ে শর্তের ওপারে
আমিও চশমা খুলে টেবিলে রেখেছি,
তখনই এস-এম-এস এলো- 'আমি পৌঁছেছি'
কোথায় পৌঁছালি তুই, গভীর জঙ্গল?
ব্যালেন্স কম, পরস্পর লক্ষ মিস্‌ড্‌ কল
তোকে ছুঁয়েই চলে আসছে আমার সেল ফোনে।
(আচ্ছা বান্ধবী কি রবিঠাকুর শোনে ?)
প্রতিদিন ধাক্কা খায়, প্রতিদিন ঘামে,
আমি শপথ নিই শান্ত প্লাটফর্মে-
''কখনো বলব না আর কখনো শুনবো না
কখনো কাউকে কিছু জিগেস্‌ করবোনা।''
এখনও আমার সব হাড়-পাঁজর ভিজে,
খোলস বদলালাম বিকেলে, রেলব্রীজে।
তোকেই আশ্রয় করি, প্রজ্ঞা পারমিতা।
তোর সঙ্গে সৃষ্টি হোক সহস্র শত্রুতা।
কখনও বলব না কিছু বুদ্ধু চূড়ামনি,
আমি এখন ফেরত আসার যন্ত্রণাটা জানি।
এটুক বলব শুধু গদ্যে হাবেভাবে-
''এ মেয়েটা বাড়ি ফিরেই মেঘ হয়ে যাবে।''

সোমনাথ

অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি

১.
যখন নিক্ষি প্ত পাশুপত...!

তোমার নারীরা নিয়ত পুরুষ বানিয়েছে
পুরুষেরা যোদ্ধা

কোন বিভ্রমে শিরোস্ত্রাণ খুলে ফেলার পর
কুরুক্ষে ত্রটাই উপহাসময়।

এবার যদি দু'হাত শৃঙ্খলে বাঁধ !
কথা দিলাম— স্পার্টাকাস নয়,
মাত্র দু'টি চকমকি পাথর জ্বেলে
পোড়া কাঠেই—আঁকবো আলতামিরার
গুহাচিত্র, 'বাইসন!' আবার।

২.
যখন আঙুল ছুঁলো ঠোঁট ! বজ্রপাত,

তোমার আগুন ছোঁয়া পেতে ! তুষ-আগুনে হাত।

এক আকাশ (ভালোবাসি...! নির্জন আলাপ।

এ হাতেই হত্যা যখন ?

পোড়ামুখী (সব পোড়ালি
হিসাব রাখার সিকি-আধুলি

৩.
আকাশ তো নয়... !

দু'চারটে উড়নচন্ডী মেঘ
কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি(শিশির হয়ে ঘাসে
শীত দুপুরে শরীর সেঁকার আবেগ
ফর্দ মিলিয়ে দেখি—
তোর গন্ধ যখন — শ্বাসে।

তোকে তো নয়... !

বলছি যখন তোর কোল জুড়ানো সবুজ
ফর্সা হওয়া জানুর ভোরে
গোড়ালি ছোঁয়া বারুদ
নষ্ট হওয়া গোপন ভ্রূণে
নামনা বৃষ্টি (ঝরে

৪.
পৌষালি রোদ্দুর বারান্দা — ক্ষ মা করো
শীর্ণ মহানন্দা — ক্ষ মা করো

ক্ষ মা করো প্রেম ! ক্ষ মা-আজীবন...

কথা দিয়েছি মৃত্যুকে(
তোমাতেই সংগোপন।

নিবন্ধ

'বুকের আগুন বাঁচিয়ে রাখাকেই সন্ত্রাসবাদ বলে'

চন্ড ভার্গব

আরব সাগরের তীর থেকে গোদাবরী-তট হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা—ঢেউয়ে ঢেউয়ে উত্তোলিত হয়ে ওঠে একটি শব্দ—সন্ত্রাসবাদ, কখনো গাড়ি-বোমা, কখনো Land mine বা কখনো AK সিরিজের রাইফেলের নলে অথবা গ্রেনেড এর সপ্লিন্টারে ছড়িয়ে পড়ে নিরাপত্তাহীনতা আর আতঙ্কের এক হাড়-হিম স্রোত, আর সেই একই আতঙ্কের হিমশীতলতা নিয়েই নতুন সূর্যোদয় ঘটে (হয়ত প্রতিদিন)।

তাই গৌহাটির বাজারে, অথবা, কাশ্মীরের রাস্তায় নিহত সংখ্যাটার সাথে গোকুলনগর বা বৃন্দাবনচকে নিহত মানুষের সংখ্যা একাত্ম হয়ে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকার এবং দলতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করে।

'...দালাল দালালী করে,/নেতা, নেতাগিরি...'—বোফর্স থেকে শুরু করে হাল আমলের স্করপিয়ান সাবমেরিন কেনা, সামরিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়বিক্রয়ে ঘুষ দেওয়া নেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাই সন্ত্রাসবাদ বেঁচে থোকা খুবই জরুরী। কারণ সন্ত্রাসবাদের জুজু দেখিয়েই সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো চলে, সন্ত্রাসবাদের জুজু দেখিয়েই কাশ্মীর আর গোটা পূর্ব ভারতের স্বাভাবিক জনজীবনকে স্তব্ধ করে দেওয়া চলে। আবার এই সন্ত্রাসবাদী তকমা মেরে গণ আন্দোলন এর উপর সীমাহীন দমন নামানো চলে। এমন কি ভোটের বাজারে এটা একটা বড় ইস্যু হয়ে ওঠে। তাই পুঁজির অভাবে শিল্প, রাস্তাঘাট নির্মাণে অপারগ সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে USS Goroskov কিনতে পারে, IRB-র নতুন নতুন ব্যাটেলিয়ান, সেনাবাহিনীর নতুন command তৈরী করতে পারে।

সমাজতন্ত্রের অতি মূর্খ ছাত্রমাত্রই জানে যে সন্ত্রাসবাদ সহ যাবতীয় চরমঅবস্থার মূল কারণগুলি কি? স্বাধীনতা-উত্তর ষাট বছরেও সে দেশের মানুষ পিঁপড়ের ডিম, মেঠো ইঁদুর এবং আমের আঁটি খেয়ে থাকে, যেখানে অনিচ্ছুক কৃষককে রক্ত দিয়ে মাটি মায়ের ঋণ শোধ করতে হয়, যে স্বাধীনতার গণধর্ষণের পর তার মা-বোনকে যোনিতে গুলিও খেতে হয় বা একটি জনজাতিকে অনায়াসে encounter এর খোরাক করা চলে সেখানে mine blast কিখুব অসম্ভব? ইরাকের একটি অতি পরিচিত গল্প হলো যে, একটি আট বছরের বালক ক্রমাগত চিৎকার করে বলছে—আমাকে একটা রাইফেল এনে দাও, যে মার্কিনী সেনা আমার বাবাকে তুলে নিয়ে গেছে, তাকে আমি হত্যা করব। গল্পটা কাশ্মীর, মনিপুরের ক্ষেত্রেও সমান সত্যি, নন্দীগ্রামেও আমরা

অনেকে ঐ বালকটার সাথে একাত্ম হয়ে গেছিলাম। কে জানে এরকমই অগনিত বালকের আর্ত চিৎকারের শব্দগুলো বুলেট, গ্রেনেড হয়ে দিকে দিকে আছড়ে পড়েছে কিনা? নন্দীগ্রাম, মনিপুর, কাশ্মীরী রমণীদের রক্তাক্ত যোনি Mine হয়ে ভাদুতলায় ফেটেছে কিনা?

''...তবুও ধমনীতে, তোমার স্মৃতিরা থাকে বেঁচে' —যে মানুষটা এই পীরপঞ্জাল পেরিয়ে এসে এইমাত্র শহীদ হলো বা আসাম রাইফেলস্ একটু পরেই যাকে encounter করবে অথবা বস্তারে আদিম অরণ্যের অন্ধকারে ঝলসে উঠছে যার অতি জীবন্ত চোখ জোড়া, তারা প্রত্যেকেই প্রতিস্পর্ধা ভাবনায় এক হয়ে যায় রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে খতম হয়ে। হয়ত তারা ভুল, তবুও ট্রেনে বাসে, মূল্যবৃদ্ধিতে আর বেকারীর চাপে নিষ্পেষিত হতে হতে কোথাও না কোথাও একটা সমর্থন তারা পেয়েই যায়। আমাদের অপ্রাপ্তি সকল, বৃহৎ কাছে নির্বাক অসহায়তা কাশ্মীরের রাস্তায়, পালামৌ-গমলা-বস্তারের জঙ্গলে, আসাম ও মনিপুরের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হয়ে ওঠে। আর যুগান্তব্যাপী রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সম্মুখীন হয়ে—'ধরা পড়ে যায় দেহটাই শুধু/ধরা পড়বে না মন/ধরা না পড়ার হাওয়ায় দুলছে/সুদূরের শালবন'।

আমরা বোমা বানাতে পারি না। রাস্তা আটকে, গাড়ি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারি না। পারি না— বিরুদ্ধ মত কে খেউড় দিয়ে অগ্রাহ্য করতে।—আমরা শুধু কলমের পর কলম লিখে প্রতিবাদ করতে পারি। নিন্দুকেরা 'আঁতলামি'— বললেও আত্মাকে প্রশ্ন করে তৃপ্তি পাই। —সময়(তোমাকে...।

কাব্যিক-গদ্য

কারনেশন-ওয়ান

তমাল রায়

ওদের উদ্ধত রাইফেলে আমি আর ভয় পাই না। ভয় পাই না। ভয় পাই না ওপরে উড়তে থাকা কম্যান্ডো হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসা সৈনিকদের। মরতে তো একদিন হবেই—তবে তার আগে লক্ষ্যে পৌঁছাব (পৌঁছাব লাব্-ডুব্ করতে থাকা তোমার ওই লাল হৃদয়ের কাছে। এখন আমার মাথার উপর দিয়ে, পাশ দিয়ে, চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বিষাক্ত বারুদ। আর আমিও অবহেলায় ছুঁড়ে দিচ্ছি গ্রেনেড, এ. কে-ফিফ্টি সিক্স থেকে বেরিয়ে আসা গুলি বারুদ। মুহূর্তে শ্মশানে পরিণত হওয়া ঐ সব বদ্ধভূমি আমি পেরিয়ে যাচ্ছি অবহেলায়। দড়ির উপর যে জীবন তার ডাইনে, বাঁয়ে, নীচে—সর্বত্রই তো ওৎ পেতে মৃত্যু! সে তো আমি জানি। জেনেছি কবে থেকে, যবে থেকে শুরু আমার এই ফিদায়ের বাহিনীর প্রস্তুতির।

তুমি ভাবছো তোমার ওই আপাত নিরাপদ জীবনের কথা। ভাবছো সুখ-শান্তির কথা। আড়াল করছো সেই বিশ্বস্ত সঙ্গিকে। ভয় পেয়ো না। ওকে আমি কিছুই করবো না। কেননা তোমাকে অধিকার করতে ওকেই তো করতে হবে আমার পণবন্দি।

আর মাত্র দু-হাত দূরে তুমি! আমি অনুভব করতে পারছি তোমার চুলের গন্ধ, শরীরেরও। দেখতে পাচ্ছি তুমি সন্ত্রস্ত হয়ে কি নিপুণ দক্ষতায় লুকিয়ে আমাকে এস.এম.এস. করে চলেছো। তুমি বোধ হয় জানো না ওরা কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না আমার হাত থেকে।

এই নামলাম তোমার কালো কাচ-ঘেরা আপাত নিরাপদ জীবন-ঘরে। ঘামছো তুমি উত্তেজনায়। তোমার চোখের নিচে, কপালে, চিবুকের নিচে টল্‌টল্ করছে ভোরের শিশিরের মত স্বেদবিন্দু। তোমার শরীর বেয়ে নেমে আসছে ঠান্ডা রক্তের স্রোত। কোথায় লুকোচ্ছো তুমি? কে বাঁচাবে তোমায়? ওই ভীতু কাপুরুষ? ওই দেখোও তোমাকে আড়াল না করে নিজেই লুকোচ্ছে গিয়ে খাটের নিচে। একটু আগেও যে খাট ছিল তোমাদের প্রমোদলীলার সঙ্গি। হতে পারে সন্ত্রাসবাদী, তবু ওই চরম মুহূর্তেও মনে পড়ে গেল সুকুমার রায়ের কবিতার লাইন—''ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারবো না, সত্যি বলছি তোমার সঙ্গে লড়াই করে পারবো না।''

তবু নির্ভুল নিশানায় স্থির লক্ষ্যে ছুঁড়লাম গুলি তোমার লাল টুকটুকে হৃদয় লক্ষ্য করে অব্যর্থ নিশানা। তুমি লুটিয়ে পড়লে মাটিতে। না মৃত্যুকে নয়, নিশ্চিন্ত ঘুমে.....। এ গুলি মৃত্যুর নয়, বশীকরণের। আমাদের উইং কম্যান্ডার 'প্রেম' ওই নতুন অস্ত্রের

উদ্ভাবক। তোমার বিশ্বস্ত সঙ্গী একবারও ফিরেও তাকায়নি তোমার দিকে। দেখলে বুঝতো, তোমার বুক এখনো নরম ঘুঘু পাখির বুকের মতই উঠছে-নামছে।

আপাততঃ আমার অপারেশন শেষ। তোমাকে নিয়ে আমি চলে যাব যে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলাম তারই অতলে। ওখানে সংসার পাতবো আমরা মাছ, কোরাল আর সামুদ্রিক শেওলাদের সাথে। আর ঐ নিচ থেকে উঠে আসা কম্যান্ডোদের গুলি যদি আমায় স্পর্শ করে তবে নীল আটলান্টিক আকাশে, সেখানে মেঘ আর পাখিদের মাঝে গড়ে উঠবে আমাদের সংসার।

ভয় পেয়ো না(তোমার ওই কাপুরুষ সঙ্গিকে আমি রেখে গেলাম ওই কম্যান্ডোদের জন্য। ওরা ওকে ঠিক বাঁচাবে। ভয় পেয়ো না আমাকে। অর্দ্ধেক জীবন তো কাটালে এক কাপুরুষের সাথে। দেখো না, একজন কাপুরুষের সাথে থাকলে কেমন লাগে। ওই দেখো কম্যান্ডোরা আমাদের একদম কাছে। একজন সন্ত্রাসবাদীকে ধরতে দু'শো জন! ওরাও নাকি পুরুষ!

আমি আমার মাথায় ঠেকিয়েছি বন্দুকের নল—ট্রিগারটা টিপে দিলাম—ঘুম পাচ্ছে আমার.....।

কারনেশন-টু

আর, ঠিক চোদ্দ বছর বয়সে সে, তার প্রথম চুমুটা খেয়েছিল আমাকেই।

—'সে' মানে ?

—'সে' অর্থাৎ সেই মেয়েটা। আর ঠিক তখনই গাছের পাতা কাঁপছিল তিরতির করে। কালো করে আকাশ মেঘ কাঁপছিল দুরদুর করে। বৃষ্টি নামল আকাশ ঝেঁপে।

—তারপর ?

—বৃষ্টিতে ভিজলাম সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠে...

—আর আশপাশে ?

—কেউ না থাকারই কথা ছিল, তবু তো ছিল। অন্ততঃ শ'দুয়েক পুরুষ মহিলা। তাদের হাতে ছিল উদ্ধত তীর, ধনুক, বর্শা, টাঙ্গি, হয়ত বা লুকোনো কোনো জায়গা থেকে বন্দুকের নলও।

—তারপর ?

—তারপর অনেকবার চুমু খেয়েছে, শেষ খেয়েছিল একুশ বছর বয়সে। তা প্রায় ঐ সাতবছরে.....না হিসেব করে বলা যাবে না।

—ওই লোকগুলো কিছু করল না ? ছেড়ে দিল !

—প্রশ্নটা হওয়া উচিত ছিল লোকগুলো কেনই বা ওখানে, কেনই বা ওদের ঐ

জঙ্গলমহলের অস্ত্র উদ্ধত আমাদের দিকে !

—হ্যাঁ, কেন ?

—কেন ? সম্পূর্ণটা জানলে ওখান থেকে আর কোনোদিনই বোধহয় ছাড়া পেতাম না। পেতাম না ওর একুশতম জন্মদিন পর্যন্ত প্রতিটা চুমুও। কেবল এটুকু জানতাম, ও ছিল ওদের একজন। আর আমি ছিলাম ঐসব গরিব-গুর্বোদের তাত্ত্বিক শহুরে প্রশিক্ষ ক। যে প্রতিদিন সন্ধের পর হারিকেনের আলোয় বুঝিয়ে দিত বছরের পর বছর ধরে কি অন্যায় বঞ্চনা, অবহেলার শিকার ওরা। কিভাবেই বা ছিনিয়ে নিতে হয় নিজেদের অধিকার.....

—তাহলে ওরা কেন তুলে নিল অস্ত্র। মুক্তিদূতের বিরুদ্ধে ?

—মুক্তিদূত! হাসালে। ফাঁক ছিল কোথাও। হয়ত বুঝে গিয়েছিল এই দেশটার মত আমিও বোধহয় ওদের সমস্ত অর্জিত সম্পদ কেড়ে নিয়ে উপহার দেব বঞ্চনা, অবিচার।

—তাহলে ?

—তা'লে ছেড়ে দিল কেন, এইতো ? ছেড়ে ওরা দেয়নি(সে রাতেই ওই জঙ্গলমহলের দেবীর সামনে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করতে হয়েছিল। অবশ্য বিয়ে বলতে ওরা যা বোঝে।

—তারপর ?

—সে রাতে ওর ওই ঘুঘু পাখির মত শরীরে নিজের শরীর প্রবেশ করিয়ে শুষে নিয়েছিলাম সব উষ্ণতা। ওর ঠোঁট কাঁপছিল, চোখ খুলে তাকাতে পারছিল না লজ্জায়। ওর বুকে মাথা রেখে ঘুঘুর ডাক শুনতে শুনতে কখন যেন ভোর—

—তারপর ?

—তারপর ঐ ছোট ছোট পাহাড়, নদী, ঝরনা, শাল, মহুয়া-ঘেরা অরণ্য কবে যেন ওর আর আমার রাজ্যপাট হয়ে গেল। আমি সে রাজ্যের রাজা, ও রানী। পাহাড়কে ডাকলে পাহাড় ঝর্নাকে পাঠাত আমার পা ধুতে। ও মহুয়াকে ডাকলে সে খেতে দিত তার বুকের রস আমাদের মাতাল করতে...

—তারপর ?

—মাতাল তো আমরা আগেই হয়েছিলাম, নেশায় বুঁদ হয়ে কেটে যেত সকাল বিকেল রাত্রি। ছোট ছোট তিতির পাখী, টিয়ার ঝাঁক, কাঠবেড়ালী, খরগোশ আমাদের সাথে কাটছিল তাদেরও দিন রাত।

—তারপর ?

—যে কোনো নেশাই তো একদিন ফিকে হয়! তারপর আস্তে আস্তে কেটে যায়!

—তো সে নেশা কি কাটল একুশ বছর বয়সে ?

—আমার নয়। ওর বোধহয়! নাকি দুজনেরই! আসলে রক্তের তেজ বড় ভয়ংকর। বঞ্চনার প্রত্যুত্তর, প্রতিরোধের ভাষা অনেক সশস্ত্র। সবসময়ই কি তা প্রদর্শকের চিনিয়ে দেওয়া পথে চলবে। ওদের হয়ত তখন বাঁধ ভাঙার সময়, সময়েরও। বুঝতে পারিনি, পড়তে পারিনি ওদের মনের ভাষা, প্রাণের উৎরোল। আর আমি নিজেও তো তখন অশক্ত, পাখির ডাক শুনতে পাই না, নদীর জল অস্পষ্ট লাগে। পুলিশের মার খেয়ে কলকব্জা সব বিকল.....

—ফিরে গেছিলে?

—ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়া পেয়ে গেছিলাম।

—কি বুঝলে?

—কি আর বুঝব! পৃথিবীতে কোনো শূন্যস্থানই কি শূন্য থেকে যায়!

—আর সে?

—সে এখন ঐ জঙ্গলমহলের অবিসংবাদী নেত্রী। আরও তেজালো, আরও ভয়ানক। হিংস্র নাগিনীর চেয়েও ভয়ংকর।

—শেষ চুমু?

—চুমু অথবা ছোবল। বিষে নীল হয়ে গেছিল শরীর। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, জল তেষ্টা পাচ্ছিল..... শুকনো শাল, মহুয়ার পাতা ঢেকে দিচ্ছিল শরীর..... আর অস্পষ্টতায় দেখছিলাম সেই দৃশ্য মাদল বাজছে, মহুয়ার নেশায় আকাশ তখন লাল আর সেই দিগন্তবিস্তৃত বৃষ্টি ভেজা মাঝে কয়েকশো তীর, ধনুক, বল্লম, টাঙ্গির মাঝে সেই মেয়েকে চুমু খাচ্ছে নতুন অভিষিক্ত রাজা!

—আর সেই লুকানো বন্দুক?

—আমার হাতেই ছিল, এই তো দ্যাখ যা থেকে ট্রিগার টিপছি আমার মাথায়।

ওপার বাংলার কবিতা

হরিচরণ সরকার মন্ডল

জন্মদিন

বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে অখন্ড
শোকে। অন্ধ স্থবিরতা
বিছিয়ে হাঁটছে রসিকজন।

ভাঙন জুড়ে গাজন শব্দে
জ্বলে উঠে জন্মদিন।

নদী ডাকে জল লহর ডাকে
মগ্নতা ছুঁয়ে থাকে সর্বভুক
কষ্টে বিভক্ত তরঙ্গ ঘিরে ব্রতকথা

বেরসিককানামাছি আড়াল
ভিটেমাটি মুখ
থুবড়ে কাঁদে।

মশিউর রহমান মসী

স্বপ্ন

মহাকাল মহাকাশে শান্তির ধূমকেতু উড়ন্ত
আলোকবর্তিকা পৃথিবীতে নেমে আসে
প্রেমের অমিয় বাণী।

হিরোশিমা নাগাসাকি ধুয়ে ফেলি নায়াগ্রার জলে
সভ্যতা জানান দেয় আত্মা-মহাত্মা-মানবাত্মার
প্রতিনিধিরা বিবেকের দংশনে মানুষ হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর কোথাও ব্যবহার উপযোগী একটি আগ্নেয়াস্ত্র
অবশিষ্ট নেই। তাবৎ মরণাস্ত্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্পন্ন
করেছে বিগত সময়
আর শুধু ভালোবাসার ঢেউ
খোলা হৃদয়গুলো উচ্ছ্বাস হয়ে দু'কুল ভাসায়।

সাইফুল আহসান বুলবুল

গন্তব্য

চার বর্গফুট জানালার নিঃসর্গ—
একই অষ্টপ্রহর।
ঘোলা বর্ণহীন আকাশে বৃষ্টিহীন
পাঁশুটে মেঘ
প্রান্তরে নেই রঙ কোন সবুজ
ছায়াহীন বৃক্ষ।
কোথায়? কার কাছে যাই?
গাঢ় জোৎস্নায়!
তবু এখনও আছে বুঝি নদী শুধু
নদীরই মতো।
ভাবি, কোন একদিন হেঁটে হেঁটে
একা চলে যাই
নদীর কাছে, নদী, শুধু নদী হতে।

নিখিল চৌধুরী

দ্বিচারিণী

একটা সুখ আমাকে তাড়া করছে
কুরে কুরে খাচ্ছে স্যাঁতসেঁতে তেড়ে ওঠা
লোমকূপ(কিছু মাংস।
কাত, চিত-উপুড় অরোধ্য আটপৌরে—
গুগলি ও হুতোম পাকড়াচ্ছে অযথা
ক্রমান্বয়ে ক্রমাগত।

নরপশু হিংস্র-ক্ষু ধার্ত, আস্ত জানোয়ার
আষ্টেপৃষ্ঠে রেখেছে সজারু ও সাপ
অন্তঃপুর ফোঁকে হাতুম বাঁদরী ভিনদেশী ভিন্নরূপী
শুঁকছে সুগন্ধি রক্তের স্বাদ। তদুপরি—
ঢেলে দিচ্ছে হৃদপিন্ডে ব্যাপক বধির বিষ
ঠুঁটো জগন্নাথ ভূত।

ভেস্তে গেল মাখামাখি সান্নিধ্যের সুড়সুড়ি
পরম পবিত্র আরাধনা, দীপ্ত ফকফকে
নতুন মুখ, অচেনা কিংবা অপরিচিত।
মজ্জা, মাংস পুড়ে যায় জঘণ্য ব্যবহারে
নখরামি শেল পোঁতে, জীবন্ত লাশের খুলিতে
খামোকা ঠুকে ঠুকে।

ভস্মমুখ ধুম্রনাসা আমাকে চেটেপুটে খাচ্ছে
খাম্চায় পাঁজরের হাড়ে ক্রূর ডাইনি
বিষর্জ্জর ক্রমশ শকুনির মত।
কথকতা মেয়াদোত্তীর্ণ অন্তরীক্ষে বাসি—
দ্বিচারিনী সাঁতরায় তবুও নিঃশব্দ ভূ-ত্বকে
বারংবার, নিতান্তই আচমকা।

সমরেশ দেবনাথ

ভিক্ষু কগণ

ভিক্ষু কগণ,
আপনাদের জন্য সুসংবাদ!
বিশ্বব্যাংক খালি হয়ে গেছে কুমিরের পেটে (
বাকী যা ছিলো ধার নিয়ে গেছে—
বহুজাতিক বিজ্ঞাপন,
সুন্দরীদের পা-নখ সাজাতে!

ভিক্ষু কগণ,
ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে রাখুন
ওতে ছায়া পড়বে ঐশ্বর্য রাই এর—
পেটে ইঁট চাপা দিয়ে
ভিক্ষাপাত্রে নিয়ে যান হস্তমৈথুন!

ভিক্ষু কগণ,
ঈশ্বর শুয়ে আছেন গণতন্ত্রে,
একটুখানি তুলে নিন পেঁয়াজ মাখা ভাতে,
মস্তিষ্ক চাঙ্গা থাকবে
ঈশ্বরবায়ু সেবনে!

আশিকুর রাজ্জাক

মানুষ

সুবিশাল বৃক্ষে র কাছ দিয়ে যেতে যেতে
দীর্ঘ সড়কপথে একাকী কোন মানুষকে
পিপীলিকার মত মনে হয় (
অজস্র অসহ্য অন্ধকারের মাঝে
ছিটে-ফোঁটা শুভ উদ্যোগ
নগণ্য মনে হতে পারে—
অথচ মানুষের অবয়ব বৃক্ষে র চেয়েও বিশাল
মহাসড়কের নির্মাতা—সে তো মানুষই
সততার শক্তি অপরিমেয়
মানুষ সভ্যতার নির্মাতা, আলোর বাহক (
তবে গড়নে-আভরণে মানুষ মনে হলেও
সব প্রাণীই মানুষ নয়।

নাজমা আকতার

কবিতা বিকেলে মাঠ ছেড়ে

কয়েকজন মানুষের গহীন কিছু বোধ,
একান্ত অনুভব, অনায়াসে উচ্চারিত হয়
উদাসী বিকেলে, সবুজ গালিচায়।
উড়ে আসা মেঘের মতো শব্দমালায়

বৃষ্টিপাত হয় কখনও—
অচেনা রশ্মি কখনও
আলোকিত করে অন্ধকার কোন উঠোন
বয়ে যায় সুবাতাস, রুদ্ধ বন্ধ কুঠুরিতে—
ভাবি, কবিতা হয়ে যাই

ভাষাহীন কোন দৃষ্টিতে—
ছুঁয়ে যেতে পারিনা কোন রোদ
কবিতা বিকেলে মাঠ ছেড়ে
চলে আসি একাকী অলক্ষ্যে।

বদরুল হায়দার

কবি ও আধিপত্য

কবি সময়ের অন্তর্ঘাত জানে
তাকে কেন শূণ্য হতে বলো
সে তো অফুরন্ত অনিদ্রার ভ্রূণে
চুপ হয়ে থাকা একটি অখন্ড।

বোবা বাতাসের আ-শরীরে মিশে থাকা
বেদনার সবুজ স্বদেশ
ভাষার রক্তকে ছুঁয়ে সেও
যুদ্ধ ও যুদ্ধ বিরতিতে
অসংখ্য তারকার বুকে দোল খাওয়া
বিনাশের শেষ থেকে শুরু।

তাকে আশূণ্যের গান গেয়ে
প্রলোভনে চুপ করে রেখে
ভুলের আকাশে তুমি উড়ে বেড়াও স্ববেগে
আর আমি যতবারই উড়েছি
জন্ম ও মৃত্যুর বিভাজন আমাকে নির্মাণ
করেছে একটি পূর্ণ আধিপত্যের।

সুফী সৈয়দ রুপক রশীদ

অগস্ত্য যাত্রা

পায়ের তলায় যার শস্যভূত ফলায়
ঘর কি তারে বরসাজে ধরে রাখতে পারে?
পথিকভূত সারথী ইশারায় ডাকে—কুহেলী অভিসারে
পঞ্চভূত সম্ভূতে পথে-বিপথে অগস্ত্য যাত্রায়।
মনি-অমার চন্ডীমন্ডপে উড়ণচন্ডী নর্তন-কীর্তন
খোল করতাল শঙ্খনিনাদ হরবোল উৎরোল
ভূম আত্মহরি (াদিনী গুরুধ্বনি বোল,
দহন আর দাহনের অদ্ভূত-কিম্ভূত আত্মোল্লাস ক্ষণ!

অশ্বত্থ নাগিনী শিকড় পেঁচানো ভগ্নসমাধি
কংকালসার মঠের ত্রিশূল চূড়ে আসীন উপম,
রাক্ষুসী পেঁচার থেমে থেমে ডাকা অন্ধকুহুক স্বর
নিশুতি কালিমা সুন্দরম ভোলানাথ শিবম।

গৈরিক চাদরের তলে ঝিমায় সন্ন্যাসী রঙ্গরাত
নড়েচড়ে উঠে বোধিনী আগামী যাযাবর পথে—
ভৌতিক অবকাশ অধিবাস অধিভূতের সাথে,
কাল-অকাল-আকাল-মহাকাল
রূপ-রূপক আত্মভূম সাক্ষাতে।

আক্রমণ করেছে কারা? কারা মোছে গান আর কবিতা! করা মুছে দিচ্ছে সব বাংলা জানা ঘাসের শিশির! ছোট্ট পুকুরের হাঁস, কলমিলতা, ভোরের বাউল। তাদের ঠেকাবো বলে— আমরা বাংলা ছন্দ জানা তির। বাংলা গদ্যের শব্দ সৈনিক — সময়(তোমাকে...।

মাসুম রেজা তরু

মিলন

এ আমার
না পাওয়ার দীর্ঘ পারাপারে পথ,
এখনও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে
শাল পিয়ালের বন ফেলে
সদর দরজা মাড়িয়ে ঠিক শূন্যতার নিঃশেষে।

আর একটু পরেই গোধূলির লগণ শুরু,
চারদিক সাজ সাজ কোলাহল মুখরিত বিজন।

আমাকে স্বাগত জানায় আগামী প্রস্থানে
দেহ বদলের ইচ্ছায় সরীসৃপ
হাত নেড়ে নেড়ে বিদায়ী ট্রেনের শেষ হুইসেল,
জীবনের লাল-সবুজ পতাকা পত্ পত্ করে
কি কথা বলে গ্যাছে পৃথিবী তুমি কী জান

আমার মৃত্যুর দিন গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়বে
দু'ফোঁটা মুক্তার মতো জল
কপোল মাড়িয়ে
তোমার সাদা কাফনে মন।

তবুও নারী কিংবা প্রকৃতি ভাবায় না কিছুতে
আমিও কামনায় রোদ পুড়ে পুড়ে নিষ্কাম
দেহের ভেতর হেঁটে বেড়াই,
কেননা সেও আমি প্রকৃতির মতো।

তোমার অধর ছুঁয়ে অন্ধকার নামে
ঝলঝলে রোদের মিছিলে।
দেহ পুড়ে যায়, মন পুড়ে যায়
ইদানিং স্বপ্নেরাও পুড়তে শুরু করেছে
টেংরাটিলার মিথেন দহনে।

আমি পশ্চিমে আর তুমি পশ্চাৎ-এ
দুই কুল ব্যবধানে দেহ মন,
কেবলই রক্ত ক্ষ রণ—অমরাবতী
স্নায়বিক ক্রিয়া।
স্বপ্নিল মনের দেশে
শুধুই রেখে গেলে হাহাকার,
নদী ও মোহনায় সাগর একাকার।

মৌ মধুবন্তী

রক্তনদী একা

যে পথ একা হাঁটার কথা
সে পথে অচেনা দোসর বেমানান
বৈষম্যের জগতে বাঘের সাথে সহবাস
বরং অনেক সহজ
দুই পায়ের জন্তুগুলোর দাঁতাল কামড়
কুরে কুরে খায় জীবনের চারিপাশ
মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর কিছু দেখে
মৃত্যুও কেঁদে ওঠে ভয়ে।

কী ভেবেছো? বনে বাঘ নেই
নির্জন বাসের স্বাদ নেবে নিশ্চিত মনে
সেও কি হয় শেয়াল-কুকুরের ঝাড়ে
মন-হীন ঐ শকুন শকুনির চারণভূমিতে।

কী ভেবেছে? তোমার চোখে জল নেই
সে দেবে, তারা দেবে, তাহারা দলবদ্ধভাবে দেবে
জ্বালিয়ে দেবে পুড়িয়ে দেবে, কেটে কেটে সাগর বানাবে
নদীতে তাদের বিশ্বাস নেই, তাই নিষ্কৃতিই সারকথা নয়
জল দেবে, রক্তজ্বালিয়ে জলের ধারা দেবে, দেবে বইকি!
একটু না হয় বসো আরো, তোমার বুকে পাথর বাঁধো
জল দেবে, রক্তজ্বালিয়ে জলের ধারা দেবে, দেবে বইকি।

দেবে বইকি
দেবে বইকি
দেবে বইকি- রক্তজ্বালিয়ে- রক্তজ্বালিয়ে
রক্তজ্বালিয়ে রক্ত-জলের ধারা দেবে, দেবে...দেবে বইকি
তখন কি আর একলা বলো? তুমি আছো রক্ত আছে
রক্ত-নদী দোসর আছে, কেমন করে একা?

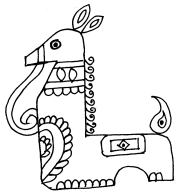

লোকসংগীত চর্চায় নোয়াখালী

বিমলেন্দু মজুমদার

'লোক সংস্কৃতির' বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে 'লোকসংগীত' একটি বিশাল স্থান দখল করে আছে। নোয়াখালী একটি সু-প্রাচীন ঐতিহাসিক জেলা। লোক-সংগীত চর্চার ক্ষে ত্রে নোয়াখালী জেলার অবদান অনস্বীকার্য। এই বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে 'লোকসংগীত' বলতে আমরা কি বুঝি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে বিশাল জনগোষ্ঠীর সাধারণ লোকের কণ্ঠ-নিঃসৃত সংগীতকে লোকসংগীত বলে। নাগরিক সভ্যতার রূঢ় বাস্তবতা এবং কর্মনাশা যান্ত্রিক সভ্যতার বহু দূরে অবস্থিত সুষমামন্ডিত প্রকৃতির অকৃপণ শ্যামলিমার অপূর্ব পরিবেশে বেড়ে-উঠা সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর মানুষগুলোর ভেতর থেকে স্বাভাবিকভাবে বিরহ, আনন্দ, সুখ ও দুঃখের যে সংগীত নিঃসৃত হয়েছে, তাই-ই আমাদের কাছে 'লোকসংগীত' নামে পরিচিত। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে আমাদের কাছে এ সংগীত ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দেয়। এই লোকসংগীতকে আমরা আঞ্চলিক সংগীত রূপে অভিহিত করি। ইংরেজীতে যাকে আমরা □□□□-□□□□ বলি, বাংলায় তাকে বলা হয় 'লোকসংগীত' । বাংলায় বসবাসকারী এবং বাংলা ভাষাভাষী লোকদের জীবনাচরণ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা এবং সামগ্রিক জীবনবোধ প্রকাশিত হয় এই লোকসংগীতের প্রতিটি পরতে পরতে।

চিরস্থায়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন হলো 'লোকসংগীত' । বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে এ সংগীত আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে এক অপূর্ব লোকদর্শন রূপে। পাঁচালী, কীর্তন, জাগগান, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, মুর্শিদী, মারফতী, পালাগান, লালনগীতি, বিয়ের গান, কবিগান, জারীগান, সারিগান, জাগরনীগান প্রভৃতি ধারার গান লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। নোয়াখালী জেলায় উল্লেখিত ধারার গানগুলো এক সময়ে প্রাচুর্যের সাথেই গীত হোতো এবং বর্তমানেও হয়ে আসছে। তবে যন্ত্রদানবের বিষাক্ত ছোবলে তা ক্ষ ত-বিক্ষ ত হচ্ছে। উক্ত বিষয়সমূহে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

পাঁচালী ঃ কখন থেকে পাঁচালী গানের চর্চা নোয়াখালীতে হয়ে আসছে তা নিরূপণ করা মোটেই সম্ভব নয়। তবে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এ গান অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিশেষভাবে নারী কণ্ঠেই গীত হয়ে আসছে। প্রাত্যহিক জীবনের নানা অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পাঁচালী গানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীর মাঝে নোয়াখালী জেলার সর্বত্রই এ গানের চর্চা বিশেষভাবে পরিলক্ষি ত হয়। বৃহস্পতিবার লক্ষীর পাঁচালী, শনিবারে শনি ঠাকুরের পাঁচালী এবং রোববারে ত্রিনাথ

দেবের পাঁচালী সুর করে পড়ার অনুষ্ঠান এখনো বিদ্যমান।

হিন্দুরা মনে করেন লক্ষ্মী ধনের দেবী। তাঁর পুজো করলে দেবী প্রসন্না হয়ে ধন-সম্পদ দেবেন এবং সোনার ফসলে গোলা ভরে যাবে। এক মনে, এক ধ্যানে লক্ষ্মী পুজো করলে দেবীর কৃপায় ধনে-জনে পরিপূর্ণ হবে ভক্তের গৃহ।

'এই ব্রত যে রমণী করে এক মনে,
দেবীর কৃপায় তার পূর্ণ ধনে জনে।
অপুত্রার পুত্র হয় নিধনের ধন,
ইহলোকে সুখী অন্তে স্বর্গেতে গমন।
লক্ষ্মীর ব্রতের কথা বড়ই মধুর,
যে জন পূজে লক্ষ্মী সে বড় চতুর।'

কিন্তু অদৃষ্টবাদীরা এর বিরোধিতা করেছেন। এ বিরুদ্ধ চেতনা পাঁচালীতে লিপিবদ্ধ আছে।

'কপালে না থাকে যদি লক্ষ্মী দিবে ধন,
হেন বাক্য কভু আমি না করি শ্রবণ।'

পাঁচালী, জারীগান এবং বিশেষভাবে কবিগানে '□□□□□□□□□' সৃষ্টি করে তাদেরকে একটি মিলনাত্মক পরিণতির দিকে টেনে নেওয়াই লোকসংগীতের ধারাসমূহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গ্রামের সহজ সরল পরিবেশে গড়ে-ওঠা মানুষগুলোর মধ্যে অন্ধ ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক জীবনকে অধিকতর মধুময় করে গড়ে তোলার ক্ষে ত্রে 'পাঁচালী' একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এক সময়ে বিশেষ করে মহিলাদের সুললিত কণ্ঠে এই পাঁচালী গীত হতো। এতে একজন মহিলা দেন নেতৃত্ব আর অন্যরা সবাই 'দোয়ারকী' হিসেবে সুর মিলিয়ে থাকেন। এই পাঁচালীকে সুশ্রাব্য করে তোলার জন্য মৃদঙ্গ, মন্দিরা, কাঁশা এবং হাতে তালি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হোতো। কিন্তু বর্তমানে বাদ্যযন্ত্র আর ব্যবহার করা হয় না।

শনিঠাকুরের পুজো অনুষ্ঠান বাঙ্গালী হিন্দুদের ঘরে ঘরে প্রতি শনিবারে এক সময়ে উদযাপিত হোতো। তা এখনো হচ্ছে। তবে এখন তা গ্রামে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেই দিন দিন সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। শনি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রহ। জ্যোতির্বিদগণ অংক কষে দেখিয়েছেন, মানব চরিত্রে শনির প্রভাব অলংঘনীয়। এই শনির পুজো অতি প্রাচীনকাল থেকেই পাঁচালী সংগীতের মাধ্যমে নোয়াখালী জেলায় লক্ষ্মী পুজোর মতই উদযাপিত হয়ে আসছে। ভদ্র-শিক্ষি ত ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু আইনজীবিরা শনি পুজো প্রতি শনিবারে করে থাকেন। পাঁচালীর অংশ বিশেষ উল্লেখ করলাম।

'শনি বলে দ্বিজ পুত্র শুনহ বচন,

শনৈশ্চর নাম মম সূর্যের নন্দন।
দ্বিজ বলে কিমাশ্চার্য শুনাইলে বাণী,
কি শুনে অধীনে কৃপা করিলে আপনি।
গ্রহরূপী নারায়ণ তুমি মহাশয়,
বুঝি এতদিনে হল ভাগ্যের উদয়।
অন্য বর কার্য নাই-দেহ এই বর,
এর ভোগ হয় ত্যাগ মম বাশি পর।
শনি বলে 'তথাস্তু' দিলাম এই বর,
মম ভোগ হবে ত্যাগ তোমার উপর।''

এখন ''ত্রিনাথ'' ঠাকুরের গান খুব একটা শোনা যায় না। এর কিছু কারণও আছে। ত্রিনাথের আসরে তিনটি কলকেতে সিদ্ধি (গাঁজা) সাজিয়ে দেয়া হোতো। গান শেষে ঐ কলকের সিদ্ধি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রসাদ হিসেবে তালুবদ্ধ করে টান দিত। সাদা মাটা কথায় বলা যেতে পারে অধুনা যেমন করে গাঁজার নেশা করা হয়, ঠিক তেমনি করেই ত্রিনাথ দেবের ''সিদ্ধি প্রসাদ'' নেয়া হোতো। মাদক-বিরোধী আন্দোলনের ফলে এখন নোয়াখালীতে খুব একটা আর এ আসর বসে না। ত্রিনাথের গানের কিছু অংশ উল্লেখ করা হোলো।

''আমার ঠাকুর ত্রিনাথ যে বাড়িতে যায়,
এক পয়সার গাঁজা কিনে তিন কলকী সাজায়,
মরি হায়রে হায়
সিদ্ধিদাতা ত্রিনাথ দেবে
প্রণাম জানাই।''

মনসাব্রত, বিপদনাশিনীব্রত, সত্যনারায়ণব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠান এখনো নোয়াখালী জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পাঁচালী গীতির মাধ্যমে পালন করে আসছে। তবে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই অনুষ্ঠানগুলোতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়ে তা উপভোগ করে থাকে এবং সবাই একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করে। তাই নোয়াখালীর এ পাঁচালী অনুষ্ঠানগুলোকে বলা চলে ''সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলা বন্ধন।''

কীর্তনঃ

কীর্তন বাঙ্গালী জীবন ধারার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কীর্তন সাধারণতঃ রাধা-কৃষ্ণের নৈসর্গিক প্রেমলীলা অবলম্বনে ভক্তি রসকে আশ্রয় করে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এর সাথে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় মৃদঙ্গ, মন্দিরা এবং কাঁশা। এতে একজন থাকেন প্রধান গায়ক এবং তাঁর সাথে আরো কয়েকজন থাকেন দোয়ারকী।

কীর্তনগুলো কৃষ্ণ বন্দনা, রাধিকা বন্দনা এবং ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমনের উপায়সমূহ পয়ার ছন্দে রচিত হয়ে থাকে। লোক সংগীতের অন্য সব ধারা থেকে কীর্তন একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে। এতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার তাল ছন্দের প্রকরণ। ভক্তিরসে সিক্ত হয়ে গায়ক-গায়িকা অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন। কীর্তনিয়ার পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে থাকে অবিলাসী বা ত্যাগীরসের স্পষ্ট ছাপ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসে সিক্ত হয়ে যাঁরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষি ত হন, তাঁরা বিশেষভাবে কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন। এই কীর্তন তাঁদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। কৃষ্ণকে সন্তান কল্পনা করে বৈষ্ণব গেয়ে থাকেন ঃ

গোপাল নাচিয়ে নাচিয়ে বেনু বাজাইয়ে
কোলে আয়রে রতন মনি।
একবার এসে ক্ষীর মাখন খেয়ে
চলে যা রে বাপ নীলমনি।

নোয়াখালী জেলায় রাগভিত্তিক কীর্তনাঙ্গের চর্চা খুব একটা হোতো না। শ্রী অতুল সূত্রধর ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানাদিতে মাঝে মধ্যে কীর্তন পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। রামায়নের কাহিনীভিত্তিক কীর্তন যখন অতুলবাবু পরিবেশন করতেন, তখন শ্রোতাদের চোখে জল দেখেছি। ''লক্ষ ণের শক্তিশেল'' পর্ব গেয়ে বাবু অতুল সূত্রধর নোয়াখালীর শ্রোতাদের অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে বসে আছেন। অতুলবাবুর লক্ষ ণ নামে একটি ছেলে ছিলো। সে অকালে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয়। ''লক্ষ ণের শক্তিশেল'' পর্ব গাওয়ার সময় অতুলবাবু নিজে কাঁদতেন এবং শ্রোতা সাধারণকে কাঁদাতেন। তাঁর পুত্র লক্ষ ণের মৃত্যুর পর ঐ পর্বটি গাইতে আর তাঁকে কখনো দেখিনি। নোয়াখালীতে লোক সংগীতের চর্চার ক্ষে ত্রে অতুল বাবুর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

কীর্তন হচ্ছে ভক্তি রসাত্মক গান। ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ বা দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত এবং রাগাশ্রয়ে সুরারোপিত গানকেও কীর্তন বলে। এমন ধারার বহুগান অতুল বাবুকে গাইতে শুনেছি। তিনি গাইতেন ঃ

''কৃষ্ণ চাই না, কৃষ্ণ নাম শুধু
লিখে দে আমারি ভালে।''

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা অপূর্ব সুরমাধুর্যে পরিবেশন করতে দেখেছি অতুল বাবুকে।

গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিসনে
ছেড়ে দে মা জননী,
মাখন চুরি করুক গোপাল
চুরি করে খাক লনী।

ও যশোদা মা.....
ওর ছেলেবেলা চলে গেলে
আর তো পাবি না,
দই এর হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেলে
খেলুক এখন নীলমনি।

ও যশোদা মা.....
দেখ মুখে চোখে দই মেখে
তাকিয়ে আছে কিভাবে,
কিছু যেন জানেনা সে
শান্ত সে কত স্বভাবে।

ও যশোদা মা.....
ঐ দুষ্টটাকে সাজা দিয়ে
লুকিয়ে কাঁদিস না,
করবি কিরে মা বলে সে
ডাকবে এখনি।

এমনি আরো বহু কীর্তনাঙ্গের গান পরিবেশন করে অতুল সূত্রধর শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর পেশা ছিল শিক্ষকতা। সোনারপুর ব্রাদার আঁন্দ্রে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবন শেষ করেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত তাঁর সহকর্মী হিসেবে ঐ বিদ্যালয়ে আমিও শিক্ষকতা করেছিলাম। তাই অত্যন্ত কাছে থেকে অতুল বাবুকে দেখবার এবং জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এবং অন্যান্য কর্মদিবসে অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় সোনাপুর মাইজদী শহরের বিভিন্ন বাসায় গিয়ে গান শেখাতেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কাদেরী কিবরিয়ার সংগীত গুরু ছিলেন এই অতুল সূত্রধর। কিবরিয়ার বাবা ডাঃ গোলাম কিবরিয়া যখন নোয়াখালী হাসপাতালে সিভিল সার্জন ছিলেন, তখন কাদেরী কিবরিয়া এবং তাঁর ভাই আঁন্দ্রে উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র ছিল। ঐ সুবাদে ওদের দুজনকে মিশন স্কুলে ছাত্র হিসেবে পাই। ওদের গৃহে সংগীত শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন অতুল সূত্রধর। তাঁর বাহন ছিল দ্বিচক্রযান। এখন আর সাইকেল চালান না। কিছুটা বয়সের ভার এবং কিছুটা অসুস্থতার কারণে অতুলবাবুকে লালপুরের বাড়ী ছেড়ে বেরোতে এখন আর খুব একটা দেখা যায় না।

বাংলার কীর্তন এবং কীর্তনীয়াদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সংগীত বোদ্ধা দিলীপ কুমার রায় মন্তব্য করেছেন, 'কীর্তন হোলো মহান নাট্য সংগীত।' এতে রয়েছে বহু

ঝংকার, বহুতালের সমন্বয়। একই কীর্তন গানে 'তাল-ফেরতা' গুনের সমাবেশ ঘটার কারণেই কীর্তনকে সম্ভবতঃ নাট্য সংগীত বলা হয়েছে। কীর্তনীয়ার বাচনভঙ্গী, মাঝে মাঝে তালে এবং লয়ে থেকে বাক্য প্রক্ষেপন করার গুনেই কীর্তন হয়ে উঠে শ্রোতার নিকট সুমধুর। এমনি ভাবারসে সিক্ত হয়ে নোয়াখালী জেলার একজন মহিলাকে কীর্তন পরিবেশন করতে দেখা যায়। তিনি হলেন শুক্লা ভৌমিক। পেশা শিক্ষকতা। হরিনারায়ণপুর বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। পিতা তারেকবন্ধু নাথ এক সময়ের প্রথিত যশা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ভ্রাতা সুখেন্দু বিকাশ ভৌমিকও সুকণ্ঠের অধিকারী একজন গায়ক শিক্ষক। শুক্লা ভৌমিক একসময়ে চমৎকার পল্লীগীতি ও ভাওয়াইয়া পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। এখন সীমিতসংখ্যক অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বিশেষভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ গ্রহণ করে কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন। তাঁর সংগীত গুরু ছিলেন প্রয়াত ওস্তাদ সত্য গোপাল নন্দী। সত্যবাবু ছিলেন নোয়াখালীর গৌরব। তিনি আধুনিক, নজরুল এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর মত একজন ওস্তাদের শিষ্যা হতে পেরে শুক্লা ভৌমিক নিজেকে ধন্য মনে করেন। পরবর্তী পর্যায়ে শুক্লা তালিম নিয়েছিলেন অতুল সূত্রধর এবং কুলেন্দু দাসের নিকট থেকে। তাঁর গাওয়া একটি কীর্তন এখানে উল্লেখ করলাম।

সখিরে প্রাণ সখি আমার।
আমি কি করি কানুরে নিয়া
সে যে নিঠুর কানাই
দয়ামায়া নাই
অতি শঠের শ্যামলিয়া।
মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব,
আমার কানু হেন গুন নিধি কারে দিয়ে যাব।
তোরা কি তা পারবি সখি
আমার কানুর যতন করতে
তোরা কি তা পারবি সখি।

না পোড়াইও রাধা অঙ্গ, না ভাসাইও জলে
মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালের ডালে।
আমি তমাল বড় ভালবাসি,
আমার কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো
তাইতো তমাল ভালবাসি।

আমার বঁধুয়া কালো, কৃষ্ণ কালো
তাইতো তমাল ভালবাসি।
কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো, তমাল ভালবাসি,
তমাল ডালে বসি বঁধু বাজাইত বাঁশী।
বাঁশী বাজাইতো বাজাইতো,
তমাল ডালে বসি বাঁশী বাজাইতো,
জয়রাধে জয়রাধে বলে, বাজাইতো বাজাইতো।
যমুনা তটিনী কুলে
কেলি কদম্বের মূলে
মোর নায়ে চলগো ত্বরায়,
অন্তিমের বন্ধু হয়ে যমুনা মৃত্তিকা লয়ে
সখি মোর লিখো সর্বগায়,
তোমরা লেপন করহে
যমুনার বারি অঙ্গে লেপন করহে,
ব্রজের রাজা বলে লেপন করহে।

এমনি আরো বেশ কিছু কীর্তন পরিবেশন করে শুক্লা ভৌমিক নোয়াখালী জেলার লোক সংগীতের অপূর্ব এ ধারাটি ধরে রেখেছেন। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার একটি বিষয় হিসেবে কীর্তনকে সন্নিবেশিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষে প নেয়ার জন্য শিল্পকলা একাডেমীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীর্তন বিষয়ে একটি পত্রে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং সুদূর ব্যাপি হৃদয়াবেগ।' এই হৃদয়াবেগের তাড়নায় আপ্লুত হয়ে কীর্তনীয়া পরিবেশন করেন রাগাশ্রিত কীর্তন। নোয়াখালী জেলায় এ জাতীয় কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন কানুলাল নন্দী। পিতা স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র নন্দী এবং মাতা মরুবালা নন্দী ছিলেন কীর্তন ভক্ত। তাঁদের সন্তান কানু নন্দীও হলেন কীর্তনীয়া। একান্ন বৎসর বয়সের এ লোকটি প্রায় বত্রিশ বৎসর কাটিয়েছেন যাত্রাদলে অভিনয় করে এবং বিবেকের গান গেয়ে। বাংলাদেশের ভোলানাথ, জয়দূর্গা, ভাগ্যলক্ষ্মী, আদি দিপালী, আদি গণেশ ও বাসন্তী অপেরায় বিবেকের গান গেয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমানে কানুবাবুর নোয়াখালী জেলার 'রিমোল্ড' এনজিওতে কর্মরত আছেন। মাইজদী এবং রামবল্লভপুরে কয়েকটি ছেলে-মেয়েকে গান শেখান। অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী কানুবাবু পরিশ্রমী এবং বিনয়ী। সংগীত চর্চা করে কিংবা যাত্রা দলে অভিনয় করে এ পোড়া সমাজে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর। এখানে কীর্তন শোনার লোক যেমন স্বল্প, ঠিক

তেমনি কীর্তন শেখার লোকও স্বল্পতম। তাই কানুবাবুকে দুঃখ করে বলতে শুনেচি, লক্ষ্মী যদি আমায় ত্যাগ করে তবে সরস্বতী কি আমায় বাঁচাবে?

যেমনি মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে গাছের মূল বাঁচিয়ে রাখে তার শাখা-প্রশাখা ও ডাল-পালাকে, ঠিক তেমনি কীর্তন ও লোকসংগীতকে সুরে, লয়ে ও তালে নিবন্ধিত করে শক্তিশালী করে রাখছে। কানুবাবুর কণ্ঠে রাধার বিচ্ছেদের গানগুলো যখন শুনতে পাই, তখন মনে হয় যেন তিনি নিজেই সমগ্র ব্রজধামে শ্যামকে খুঁজে ফিরছেন।

কেআর বাজাবে বাঁশী
শ্যাম ব্রজে নাই,
নাই গো।
মন দুঃখে কাঁদে একা
কমলিনী রাই
রাই গো।
শ্যামের বিরহে কাঁদে
কাঁদে ব্রজপুরী,
শ্যামের বিরহে কাঁদে
কাঁদে শুক শারী।
বাজেনা শ্যামের বেনু
গোঠেতে চরে না ধেনু,
ছেড়ে গেছে ব্রজপুরী
ব্রজের কানাই গো।

লোকসংগীতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিস্তৃত শাখা হচ্ছে কীর্তন। রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহ কীর্তন ছাড়াও আরো একপ্রকারের কীর্তন রয়েছে। তা হোলো নাম সংকীর্তন। সম্যকরূপে নাম করাকেই বলা হয় নাম সংকীর্তন। নোয়াখালী জেলায় নাম সংকীর্তনের প্রচলন রয়েছে বিশেষভাবে মন্দির বা উপাসনালয়কে ঘিরে। হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন, একমাত্র 'নাম' করার মাঝেই মানব জীবনের প্রকৃত মুক্তি নিহিত। কলিযুগে শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ এই নাম সংকীর্তনের প্রবক্তা। নাম সংকীর্তন গাওয়ার সময় গায়কের ভক্তিভাবই প্রধান উপজীব্য বিষয়। এই নাম সংকীর্তনকে ষোড়শ হরিনামও বলা হয়। যেমন ঃ

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।'

এতে প্রতিটি লাইনে চারটি করে মোট রয়েছে ষোলটি শব্দ, আর রয়েছে বত্রিশ অক্ষ র। তাই কীর্তনীয় গেয়ে থাকেন ঃ

'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষ র
দিবানিশি ভাব মন।
এই নামের ডোরে বন্দী যে জন,
কখনো তার হয় না মরণ।'

এ ছাড়াও নাম সংকীর্তনে গাওয়া হয় ঃ

'রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম,
রাধা-মাধব করে শ্রী রাধিকার নাম।'

অথবা গাওয়া হয় ঃ

'শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ।'

হরিনারায়ণপুরের দেবালয়ে কিংবা মাইজদী রামঠাকুরের আশ্রমে অথবা চৌমুহনী ঠাকুর আশ্রমে এবং রাধামাধবের আখড়ায় প্রতি সন্ধ্যায় এখন নাম সংকীর্তন হয়ে থাকে। এতে হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, মন্দিরা এবং কাঁশা বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দলীয় নাম সংকীর্তনে একজন থাকেন আর অবশিষ্ট দশ-বারো জন থাকেন অনুসারী। সংকীর্তন রাগভিত্তিক অথবা হালকা গানের সুরেও গীত হয়ে থাকে।

নাম সংকীর্তন একাকীও করা যায়। এতে তাল রক্ষা র জন্য হাতে তালি দেওয়া হয়। খুঞ্জরী অথবা একতারা বাজিয়েও একা একা নাম কীর্তন কেউ কেউ করে থাকেন। এঁদের সংখ্যা কম। এঁরা বলেন ঃ

'হরি দিন যে গেল
সন্ধ্যা হোলো
পার কর আমারে।'

নোয়াখালীতে আরো এক এক শ্রেণীর কীর্তনীয়া আছেন। তাঁদের বলা হয় লীলা কীর্তনীয়া। এ জাতীয় কীর্তন সাধারণতঃ রাধা কৃষ্ণ লীলা, রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে গাওয়া হয়ে থাকে। শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবন কাহিনী, রাম-রাবনের যুদ্ধ অথবা কুরু-পান্ডবের যুদ্ধ অবলম্বনে আসরে তাৎক্ষ ণিক ছন্দোবদ্ধ পদ রচনা করে রসোত্তীর্ণ সুরে লীলা কীর্তন গাওয়া হয়। এতে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় মৃদঙ্গ, মন্দিরা, দোতারা অথবা সারিন্দা। নোয়াখালীতে লীলা কীর্তনের প্রচলন রয়েছে। এখানে শ্রী ক্ষীতিশ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে লীলা কীর্তন পরিবেশন করে আসছেন। পৌষ, মাঘ এবং ফাগুন মাসে ক্ষীতিশবাবু জেলার বিভিন্ন স্থানে পাঁচ-ছয়জন দোয়ারকী নিয়ে লীলা কীর্তন গেয়ে থাকেন। হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের

অবস্থাপন্ন লোকেরা সাধারণতঃ সন্তানের জন্মদিন পালনে, পিতা বা মাতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অথবা কোনো পূজানুষ্ঠানে লীলা কীর্তন গাওয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারছেন না কেননা লীলা কীর্তন করে জীবিকা নির্বাহ করার মত অবস্থা নোয়াখালী জেলায় নেই বললেই চলে। ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার কারণে তাই হচ্ছে বলেই মনে হয়।

এখানে লীলা কীর্তনের আয়োজন যাঁরা করে থাকেন, তাঁরা সবাই হিন্দু এবং অধিকতর অর্থশালী। আবার আশ্রম, মন্দির এবং আখড়াগুলোকে কেন্দ্র করে সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমেও লীলা কীর্তনের আসর বসে। কিন্তু এ জাতীয় কীর্তনের চর্চা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। এর মূলে রয়েছে যন্ত্রদানবের আশীর্বাদ। ক্যাসেট বাজিয়ে অধিকাংশ স্থানে এ পর্বটির সমাধা করা হচ্ছে। ফলে ক্ষীতিশবাবুদের মত স্বভাব কীর্তনীয়াদের কদর সমাজে দিন দিন কমে যাচ্ছে।

(ক্রমশ)

(সর্বপ্রথম লেখকের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বানান ও ভাষা অপরিবর্তিত—সময়; তোমাকে...)

বিশেষ রচনা

ডায়েরী নম্বর ৩২/০৯ এবং হারামখোরের জবানবন্দী

(১)

হাড় হিম করে দিচ্ছে ঠান্ডায়। কাল রাত্রে বৃষ্টি হয়ে পুরো পাইনটা মেরে দিয়েছে। উফ! পেছন ফেটে যাচ্ছে। আসলে পিঠের ওপরের লোমগুলো উঠে গিয়েই যত ক্যাঁচাল। ঠান্ডায় পা-টাগুলো কাঁপছে। গায়ের ভেতর থেকে একটা কাঁপুনি আসছে। চৌধুরীদের বারান্দাটায় শুয়ে পড়ব? ওখানে বোধহয় আজকে গদাই পাগলাটা নেই। তির তির করে কুয়াশা পড়ছে, এর থেকে বৃষ্টি পড়লেই ভালো হত। দেখতে না পাওয়া বৃষ্টির মত সারা গা'টা ভিজে যাচ্ছে। ঘাসগুলো ভিজে জ্যাব্ জ্যাব্ করছে। মাঠে পা দিলে কাদা কাদা হয়ে যাচ্ছে মাইরি। উফ্ ! কি ঠান্ডারে বাপ, রক্ত-ফক্ত এবার জমে যাবে। এ রাস্তায় আমাদের কাউকে দেখছি না। খাওয়াটা আজ একটু বেশী হয়ে গেছে। ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই। আস্তে হাঁটি, অসুবিধা হবে না। পেটটা একেবারে লদ্ লদ্ করছে, এবার ডানদিকের ডাস্টবিনটা পেরোলেই বড় রাস্তা, আলো আছে। ওই তো চৌধুরীদের বারান্দাটা, বাঃ ফাঁকা আছে, চল্ ভাই বডি ফেলে দে, হেব্বি শীত করছে। কালকে নিয়ে বারো দিন হল, আজ তেরো, আমার প্রশ্নের উত্তরটা এখনও পাচ্ছি না। মা'কেও প্রশ্নটা করেছিলাম। এত বয়স হয়ে গেলো তবু বুঝতে পারছি না এ প্রশ্নের কী কোনো উত্তর নেই? সে আবার হয় না কি, প্রশ্ন আছে কিন্তু উত্তর নেই। সবার হয় দেখেছি, কিন্তু কেন? এই কিছুক্ষণ আগেও পেচ্ছাপ করলাম আর পা'টা ঠিক উঠে গেলো। কেন? যাক্ শোবার আগে একটু করে নিই। উফ! শীতের চোটে পেচ্ছাপও জমে গেলো বোধ হয়।

লে হালুয়া, ওটা কেরে বাপ! পাগলাটা আসছে নাকি ? দেবো শালাকে ঘ্যাঁক করে কামড়ে, বুঝবে কেত্তন। বেশী ক্যাওড়া ক্যাঁচাল করলে ডেকে আনবো কালু- লালু আর বুলিকে। পোঁদে মূলো দিয়ে দেবো ব্যাটার। একটু লোম ফুলিয়ে গা গরম করে ঘুমোবো— তাও বানচোৎ ভাগ বসাবে। কথাওতো কিছু বুঝতে পারে না ক্যালানেটা।

(২)

বোমা স্কুল বাসে, পৌরসভায়—বলল হুমকি ফোন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ একটি নয় শহরতলীর এক পাবলিক বুথ থেকে পর পর দুটি হুমকি ফোন করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। গোয়েন্দা সূত্রের দাবী, আপাতভাবে দুটি ফোনের কণ্ঠস্বরও ছিল এক। প্রথম দিন ফোন এসেছিল সকাল ৮টা নাগাদ, দ্বিতীয় দিন বিকাল ৩টা ১০ মিনিটে ফোন আসে। অপরিচিত কণ্ঠ, প্রায় ২ মিনিট কথা বলে জানা গেছে।

তদন্তকারীদের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১লা ডিসেম্বর সকাল ৮টা নাগাদ গিরিজা মোড় বাস স্ট্যান্ড, রথতলার কাছে একটি ছোটদের ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে ফোন করে বলা হয় তাদের একটি নির্দিষ্ট নম্বরের স্কুল বাসের ভেতর বোমা রয়েছে— ৮টা ৪২ মিনিটে যেটি ফাটবে। ফোনটি ধরেন স্কুলের এক কর্মী, এর পর অধ্যক্ষ াসহ স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়। বাসটি তখন গোলদিঘি দুধ ডিপো থেকে ছাত্রছাত্রীদের তু লছিল। বাসের ড্রাইভারকে এ খবর পাঠানো হলে ড্রাইভার ও খালাসি দু'জনেই বাস ছেড়ে পালায়। বাচ্চারা তাড়াহুড়ো করে বাস থেকে নামতে থাকে, এদের প্রত্যেকেরই বয়স ৫-৯ বৎসর। হুড়োহুড়িতে অমিত নায়েক (৭) ও জিনিয়া দাশগুপ্ত (৬) নামের দুই শিশু পদপিষ্ট হয়ে মারা যায়।

অন্যদিকে নারায়নপুর পৌরসভায় ২রা ডিসেম্বর বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে ফোন করে বলা হয় উপপৌরপ্রধান এর ব্যবহৃত একটি নির্দিষ্ট নম্বরের গাড়ীর ডিকিতে রাখা রয়েছে বোমা। এছাড়া পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পার্কিং লাউঞ্জের অন্ততঃ তিন জায়গায় বোমা রাখা রয়েছে।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার গৌরবমোহন চক্রবর্ত্তী বৃহস্পতিবার বলেন, ''আমরা শহরের অন্ততঃ ২০টি জায়গায় বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করেছি, তবে অরক্ষিত প্রতিটি বুথে নজরদারি সম্ভব নয়।' যদিও একটি বোমাও পরবর্তী সময়ে বিস্ফোরণ হয় নি, তবু মুম্বাই বিস্ফোরণের পরবর্তী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের এই ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থা শহরতলির আকাশে বাতাসে আবার ভয়ের ও আতঙ্কের বার্তা পৌঁছে দিল।

(৩)

ইহা সত্য যে নেশাগ্রস্ত মানুষ তাহার চেতন প্রবাহের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে নিমেষেই অধঃপতিত করে আপন বদ অভ্যাসের দ্বারা। সুরার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইহার ব্যবহার এবং প্রয়োগ মনোরঞ্জন তথা সাময়িক শারীরিক প্রবৃত্তিকে অন্যপথগামী করে একথাও বিভিন্ন কাহিনী কল্প এবং প্রাত্যহিক সুরাগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের আচরণে সুস্পষ্ট। এমনই এক চরিত্র অবিনাশ, যাহার জীবন ধারণের নিমিত্ত রূপে যে একটি লটারির দোকান চালায়। ব্যবসায়িক কারণে এবং দর্শকদের ও ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাহার দোকানে প্রায়শই দেখা যায় হলুদ গাঁদার মালায় সুশোভিত দৃশ্যমান হইতেছে। অবিনাশ গৌরাঙ্গ পল্লীর বাসিন্দা। নিতান্তই বাহুল্যবর্জিত তাহার জীবন। শ্রী লক্ষ্মী হালদার বাবুর গৃহে পাচিকার পেশায় নিযুক্ত। অবিনাশের একটি সাইকেল আছে। ভোরে উঠিয়া একই সঙ্গে সে খবর কাগজ ও প্যাকেট দুধ বিলি করিয়া থাকে। তাহার মা সারদা ঠোঙা প্রস্তুত করেন, দৃষ্টি তাহার ক্ষীণ, শিরদাঁড়া ন্যুব্জ, গালের

চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অবিনাশের বিবাহের পর হইতে আজ পাঁচ বছর বিধবা থাকেন গৌরাঙ্গ পল্লীর এই লাইন ঘরের কাঁচা মেঝের এক কোনায়। অবিনাশের একটি পুত্র সন্তান আছে নাম অনিমেষ। উহাকে অত্যন্ত যত্নে প্রতিপালন করিতেছে এই দম্পতি। বৃদ্ধা ঠাকুমার আদরে এবং পিতামাতার স্নেহে ও ভালোবাসায় বিল্টু (অনিমেশের ডাকনাম) একেবারে অবাধ্য ও দুষ্টু হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু লেখাপড়ায় তাহার মেধা প্রশংসনীয়। বিল্টুকে এবছরই স্থানীয় শশীবালা স্মৃতি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছে অবিনাশ। এহেন অবিনাশ আজ দুই দিন ধরিয়া বেশ অন্যমনস্ক। কাগজ দিতে যাইয়া ভুল করিয়া ফেলিতেছে। লটারীতে টিকিটের নম্বর মিলাইতে গিয়া তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছে। এত কিছু সহ্য করিতে না পারিয়া আজ অবিনাশ মদ্যপান করিয়াছে। মাত্রায় তাহা এত বেশী ছিল যে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে তাহার বমি হইল। এখন একটি ডাস্টবিনের পাশে বসিয়া অবিনাশ হাঁপাইতেছে ও কাশিতেছে। সারা গায়ে তার বমির টক গন্ধ এবং মুখে টক ও তিতা মিশ্রিত স্বাদ। ইহার সাথে যুক্ত হইয়াছে দেশী মদের উগ্র দুর্গন্ধ। ঠান্ডা পড়িয়াছে দারুন, ভীষণ কুয়াশায় রাস্তার আলোগুলিও ম্লান। আজ উষ্ণতা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

(৪)

ওয়্যাক্ খুঃ, উফ্ মাগো জ্বলে যাচ্ছে অম্বলে গলা বুক সব জ্বালা করছে। ওফ্ মাথাটা একেবারে আউট। কান্না পাচ্ছে। মাল খেলে আমি শালা রাজা হয়ে যাই। বুকের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালাও ঠিক শালা বেঁচে থাকবো। অবিনাশ চক্কোত্তি কে মারবে এমন নিখাগির বাচ্চা এখনও প্যায়দা হয়নি। আরেকটু মাল খেতে ইচ্ছে করছে, ভোকোদার ঠেকটা কত দূরে? আমি শালা মাল খাই আর তুমি শালা পয়সা খাও, সবাই আমরা ভাই ভাই চু...। যাক্ খারাপ কথা বলব না। আমার মা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে টাকা পায়, বার্ধক্য ভাতা মাসে দু'শো, তাও ছ'মাস পর পর পায়। ছ'মাসে কত হয় ? ঠিক্, বারোশো। হারামির বাচ্চাগুলো দু'শো টাকা পেছন মেরে হাজার টাকা দেয়। গরীব বুড়োবুড়িগুলো তাই নিয়ে যায়, খুশী হয়। অয়্যাক্ থুঃ। এই দু'শো দু'শো করে কতশো গান্ধি পাত্তি যে ওদের গেলা হয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নেই। আঃ, মুতছি। পোষ্টের আলোয় আমার পেচ্ছাপটাও চক্‌চক্ করছে, হিরের মতো। শুনুন স্যার, ব্যাঙ্কের পাশে ওই বড় রাস্তার দিকে একটা স্কুল আছে। বাচ্চাদের স্কুল 'Twinkling star' চক্‌চক্ করে ওদের সাইন বোর্ড। বড়ো লোকের বাচ্চারা পড়ে, ফর্সা ফর্সা বৌগুলো বাচ্চা দিতে আসে। চক্‌চকে্ গাল, চুলে রং করা। আমার বৌকেও ভালো দেখতে স্যার। লোকের বাড়ি রান্না করে করে রংটা একটু জ্বলে গেছে। আমার ছেলেটার খুব ভালো মাথা স্যার। বউ ভর্তির ফর্ম ফিলাপ করে ছিল ওই ইস্কুলে। কি বলেছে জানেন স্যার ? বলেছে 'খরচ চালাতে পারবেন তো? আমরা কিন্তু ১২ হাজার টাকা ডোনেশানটা কমাতে পারবো না।' —মুখে মুতে দিই এমন ইস্কুলের। ছেলেটার পড়াশুনার জন্য আমার বৌ আরও দু'বাড়ির কাজ ধরবে বলেছিল স্যার। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে স্যার। দোকানটা রাস্তার ধারে লাগিয়েছি বলে পার্টি ফান্ডে ৮০০ টাকা চাঁদা দিতে হল। আর কত মারবে স্যার মারতে মারতে তো খাল হয়ে গেল, এবার তো গু বেরিয়ে আসবে স্যার।

ফোনটা করার সময় কিচ্ছু ভাবিনি, কাগজে এরকম ফোনের কথা পড়েছিলাম। সাড়ে চার টাকা খরচা হয়েছে স্যার। কান্না পাচ্ছে স্যার। সবাই যখন পড়ি মরি করে ছুটছিলো খুব ভালো লাগছিলো। মনে হচ্ছিল—'দ্যাখ কেমন লাগে।' কিন্তু ওই বাচ্চাটার মুখ মনে পড়েছে স্যার নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। ফর্সা মুখটা ধূলোয় কালো হয়ে গেছে স্যার। আমার খুব কান্না পাচ্ছে স্যার। ওর ওয়াটার বোতলের মত বিল্টুরও একটা ওয়াটার বোতল আছে, খালি ওরটা সবুজ, আর বিল্টুর টা গোলাপী।

(৫)

আবার একজন আসছে মনে হচ্ছে না। ওই দ্যাখ পড়ে গেলো নর্দমার পাশে। আচ্ছা বুরবাক। কে রে ওটা, যাই দেখিতো। উফ্! আবার ঠান্ডা লাগছে। পাগলাটা আজ অন্য কোথাও শুয়েছে বোধ হয়। কে রে ভাই এটা। শুঁকে দেখি। উঁ, মানুষ তো বটেই—মাল মাল গন্ধ বেরোচ্ছে। তবে মালটা মাতাল, নেঃ ক্যালানেটার গায়ে একটু মুতেই দিই। আঃ। ওই দেখ আবার পা'টা উঠে গেল। কেন, কেন? এই প্রশ্নটা আজ সারারাত আমায় জ্বালাবে।

— হারামখোর

(এ গল্পের কোন চরিত্র কাল্পনিক নয়, বাস্তবের সাথে পাঠক মিল খুঁজে পেলে—খুশী হব। সময়(তোমাকে...)